الخرقة

সুফি স্মারক

খিরকা

তাৎপর্য এবং প্রাসঙ্গিকতা

الخرقة

মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন

সুফি স্মারক : খিরকা তাৎপর্য এবং প্রাসঙ্গিকতা

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন মাইজভাণ্ডারী একাডেমির প্রকাশনা শাখা **‘আলোকধারা বুক্স’**-এর পক্ষে

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী
মাইজভাণ্ডার শরিফ
ডাক-ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

লেখক
মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
১০ মাঘ ১৪২৭ বাংলা, ২৪ জানুয়ারি ২০২১ ইংরেজি
দ্বিতীয় প্রকাশ
১৮ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা, ১ মে ২০২৪ ইংরেজি

মুদ্রণঃ
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
ডিউ উদয়ন (১৩ তলা)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক,
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২

মূল্যঃ ২০০ টাকা মাত্র

ISBN: 978-984-8083-22-2

উৎসর্গ

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক ও পূর্ণতাদানকারী
খাতেমুল অলদ গাউসুল আযম
হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র
একমাত্র পুত্রসন্তান মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের
প্রথম মোন্তাজেম বেলায়তে মা'আব
হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)
এর পবিত্র করকমলে

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলার অশেষ রহমতে তাসাওউফ পন্থীদের দাবী এবং চাহিদার কারণে 'সুফি স্মারক : খিরকা' প্রসঙ্গে মাইজভাণ্ডারী একাডেমির পক্ষ থেকে একটি পুস্তক প্রকাশ করা হলো। পুস্তকে সুফি খিরকা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ধারণা, পবিত্র কোরআনের আলোকে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীত্ব নির্ণয়ে খিরকার আবশ্যকতা, খিরকার পরিচিতি এবং প্রকারভেদ, সুফি খিরকা সম্পর্কিত ধারণা, নবী-পয়গম্বরদের খিরকা, বিশ্বনবী (দ.) এর খিরকা ধারা, তাবেঈন এবং পরবর্তী সুফিদের খিরকা এবং মাইজভাণ্ডারীয়া সিলসিলার খিরকা এবং সুফি জগতে শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র খুসুসিয়ত (বিশেষত্ব) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তকটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো মনে হলেও বর্ণনা এবং তথ্য উপাত্তের কারণে মনে হয় এ যেন মহা সিন্ধু'র অঢেল জলরাশি।

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট পরিচালিত মাইজভাণ্ডারী একাডেমির সম্মানিত অভিভাবক মওলা হুজুর হযরত শাহ্‌ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) এর সদয় নির্দেশনার আলোকে অন্যান্য গ্রন্থ এবং পুস্তকের মতো সুফি খিরকা সম্পর্কে সর্ব সাধারণের ধারণা প্রাপ্তি এবং স্পষ্টতার জন্যে পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। পুস্তক লেখক বয়সে তরুণ এবং কঠোর পরিশ্রমী, তাসাওউফ ধারায় একান্ত নিষ্ঠাবান হিসেবে আদৃত। লেখক মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে পুস্তকটি উপস্থাপন করায় তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বইটি লিখার জন্যে তথ্য উপাত্ত সরবরাহে মাইজভাণ্ডারী একাডেমির কর্মকর্তা মাওলানা এস এম এম সেলিম উল্লাহ্‌ এবং জনাব রোকনুজ্জামান টুটুল'র আন্তরিক সহযোগিতা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্র ট্রাস্ট এবং একাডেমির আন্তরিক

তৎপরতার জন্যে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হয়। আশা করি বইটি পাঠান্তে খিরকা সম্পর্কে পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হবে এবং তাসাওউফ ক্ষেত্রে খিরকার গুরুত্ব ও অত্যাবশ্যকতা সকলের অনুধাবনে আসবে। উল্লেখ্য যে পুস্তকটিতে বর্ণিত তথ্যসমূহ সহায়ক গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

স্বল্প সময়ের মধ্যে দলিলভিত্তিক এ ধরনের একটি পুস্তক প্রকাশ করতে পারায় মাইজভাণ্ডারী একাডেমির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট লেখক এবং সহযোগিদের আবারো ধন্যবাদ জানাই। আমিন।

অধ্যাপক জহুর উল আলম
সদস্য সচিব
মাইজভাণ্ডারী একাডেমি

বিষয়সূচি

১ম অধ্যায় :
সুফি খিরকা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা – ৭
২য় অধ্যায় :
নবী (আ.) গণের খিরকা সম্পর্কিত বর্ণনা – ২৫
৩য় অধ্যায় :
হযরত রাসূলে করিম (দ.) এর খিরকা প্রদান সম্পর্কিত বর্ণনা – ৩২
৪র্থ অধ্যায় :
তাবেঈন এবং আওলিয়াল্লাহ্‌দের খিরকা সম্পর্কিত বর্ণনা – ৪৬
৫ম অধ্যায় :
হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র খিরকা সম্পর্কিত বর্ণনা – ৬৪

সুফি খিরকা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ ‘চাদর’ – ৮

সুফি স্মারক : খিরকা – ১০

আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার – ১৩

আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব – ১৫

খিরকা কী – ১৭

খিরকার প্রকারভেদ – ১৮

সুফি খিরকার উৎপত্তির ধারণা – ২১

আধ্যাত্মিক অবস্থানের স্তর নির্ণয়ে সুফি খিরকার রঙয়ের তাৎপর্য – ২৩

আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ 'চাদর'

'সসম্ভ্রমে তাঁর (আল্লাহ্‌র) মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।'

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াতাংশ : ১১১)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা অতি তত্ত্বপূর্ণ ও মাধুর্যমণ্ডিত করে তাঁর সিফাত বা গুণাবলী সম্বলিত নামসমূহ ব্যক্ত করেছেন। মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র যে সুন্দরতম নামসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে তা আয়াত বা বাক্যের গভীর তাৎপর্য নির্দেশক। এ নামগুলো পবিত্র কোরআনে হয় জোড়া না হয় বিশেষণের বিশেষণ সম্বলিত। মুসলিম চিন্তাবিদগণ কোরআনের ধারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আল্লাহ্‌র ৯৯টি গুণাবলী সম্বলিত নাম বিভিন্ন পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল "আলিউল কাবির", যার অর্থ সমুচ্চ, শ্রেষ্ঠ। উপরোল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা এমনভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর যাতে তাঁর সামগ্রিক পরিচিতি ও পবিত্রতা বিদ্যমান থাকে। এইভাবে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে হবে যে, তাঁর সমস্ত নাম উত্তম ও সুন্দর, তিনি সকল পবিত্রতা, সত্যানুরাগ এবং সৌন্দর্যের অনুপম একত্বের বহিঃপ্রকাশ, তাঁর সন্তান নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি এক ও একক। তিনি অভাবমুক্ত, তাঁর পিতা-মাতা নেই সন্তানও নেই, তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই, তিনি স্বয়ম্ভু। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন পরামর্শদাতারও প্রয়োজন নেই। বরং সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক একমাত্র তিনিই। তিনি সবারই উপর পূর্ণক্ষমতাবান এবং তিনিই সবার ব্যবস্থাপক। তিনি সৃষ্টজীবের উপর যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। তিনি এক ও অংশীবিহীন। তিনি কারো সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন না এবং তিনি কারো সাহায্যেরও আশাধারী নন। তোমরা সবসময় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, পবিত্রতা ও বুযুর্গী বর্ণনা করতে থাকো।" সুতরাং সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্ পাক অদ্বিতীয় বিধায় আল্লাহ্ পাকের ইজ্জত বা সম্মান সব কিছুর উর্ধ্বে এবং সর্বোচ্চ স্তরের অবস্থান হতে তিনি সৃষ্টিকুলের সমস্ত কিছুকে তার শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার বা গৌরবত্ব দিয়ে তৈরীকৃত অহংকারের চাদরে আবৃত করে রেখেছেন। সহিহ্ মুসলিম, ইবনে মাজাহ্ ও আবু দাউদ শরিফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলে করিম (দ.) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার পোশাক (ইযার)। অনন্তর যে ওর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে কাড়াকাড়ি করবে আমি তাকে জাহান্নামে ছুঁড়ে মারব।" হাদিস শরিফে উল্লেখিত 'অহংকার আল্লাহ্‌র চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্‌র পোশাক' উপমা দুইটি রূপক অর্থে

ব্যবহৃত হয়েছে। উপমা ঠিক এ রকম, যেমন কোনো বীর সম্পর্কে তার গুণগ্রাহীরা বলে থাকে-বীরত্বই তার প্রতীক। হাদিস শরিফের ভাষ্যানুযায়ী কিবরিয়্যত বা অহংকার যেহেতু রাব্বুল আলামিনের চাদর সেহেতু তা নিয়ে কেউ টানাহেঁচড়া করার অধিকার রাখে না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে তা অর্পণ করেন-এ ঘোষণাও তাঁরই। আর এ অর্পণ আল্লাহ্র 'প্রতিনিধিত্বে'রই স্বীকৃতি স্বরূপ। যে প্রতিনিধিত্বের বাচনিক স্বীকৃতি দিয়ে সূরা বাক্বারার ৩০নং আয়াতে রাব্বুল আলামিন স্বয়ং ইরশাদ করেন, 'ইন্নি জা-য়িলুন ফিল আরদ্বে খলিফা' (আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি)। স্বীয় বান্দাকে গৌরবের চাদর অর্পণের মাধ্যমে তাঁর প্রতিনিধিত্বে বরণের যে মহা-তাৎপর্যময় আয়োজন– তা সম্পাদন মূলত দু'ভাবে হয়ে থাকে। **এক.** দৃশ্যত, **দুই.** অদৃশ্যত। অদৃশ্য তথা আধ্যাত্মিক আয়োজনে প্রতিনিধিত্বে বরিত বান্দার জাগতিক বহিঃপ্রকাশের নিমিত্তে তাঁকে প্রদান করা হয় দৃশ্যমান একটি চাদর বা অন্যান্য বস্তু (খিরকা, জায়নামায, লাঠি, টুপি ইত্যাদি)। আর মহান রাব্বুল আলামিনের এ প্রতিনিধিত্বে বরিত অনন্য সত্তা হলেন তাঁরই হাবীব হযরত আহমদ মোজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.)। পরবর্তীতে আহলে বাইতে আত্বহারে রাসূলকে স্বীয় চাদর মোবারকে পরিবেষ্টিত করত তাঁদেরকে নিজ আহল হিসেবে পরিচিহ্নিত করে ঘোষণা দানের মাধ্যমে স্বীয় প্রতিনিধিত্বে বরণ করার তাৎপর্য হচ্ছে উত্তরাধিকারত্বের আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতবাহী।

সুফি স্মারক : খিরকা

ইসলামী আধ্যাত্মিকতার মূল উৎস হযরত রাসূলে করিম (দ.)। তিনি ইসলামী শরিয়ত ও সুফি ত্বরিকতের পূর্ণ রূপদানকারী। আধ্যাত্মিক জগতে অনেক আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি রয়েছে যা সদর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বিশুদ্ধতায় সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে। যার রয়েছে অলৌকিক আধ্যাত্মিক বিশিষ্টতা। সুফি পোষাক 'খিরকা' আধ্যাত্মিক আনুষ্ঠানিকতার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ ও নির্দেশ করে অর্থাৎ খিরকা প্রদানের মাধ্যমে খেলাফতের স্বীকৃতি উন্মোচন করে। আবার এর বিভিন্ন পরিপূরক উদ্দেশ্যও রয়েছে। খিরকাকে যে শুধু বস্ত্র হতে হবে তা অপরিহার্য নয়। খিরকা অহরহ রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর দ্বারা এমন এক সিলসিলা বোঝায় যার প্রাথমিক ও আদি উৎস হযরত রাসূলে করিম (দ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। এমনকি সুফি খিরকা দ্বারাও সবসময় বস্তুগত কিছুকে বোঝায় না। একজন উঁচু স্তরের সুফি ব্যক্তিত্বের পরিহিত খিরকা এমনকি এর অংশ বিশেষ (টুকরো) হলেও তা যদি অন্য একজন সুফি সাধক বা শিষ্য পরিধান করেন তা তাঁকে আধ্যাত্মিক অভিযাত্রায় ক্রমশ এক স্তর হতে অন্য স্তরে উন্নীত করে। তাই বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিষেধক ক্ষমতা সম্পন্ন খিরকার রয়েছে ফয়েজ সঞ্চারণ শক্তি। খিরকার এ দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যের কথাই সুফি সাধকরা স্বীকার করেন। বস্তুত খিরকা যেমন হতে পারে বস্তুগত কোনো পদার্থ তেমনি হতে পারে তা অপার্থিব বস্তুও। এছাড়া সুফি পোশাকের অন্যান্য উপাদানেরও প্রতীকী গুরুত্ব রয়েছে। গায়ের চাদর, পাগড়ি, গলার চাদর (ইযার) ইত্যাদি প্রত্যেক কিছুর আধ্যাত্মিক সাধনার স্তর নির্দেশক প্রতীকী গুরুত্ব আছে। এগুলোর মতো সুফিদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও ব্যবহৃত জিনিসপত্রও ব্যক্তিগত কামালিয়াত অর্জনের আলামতরূপে পরিগণিত হয়: নামাযের মসল্লা/জায়নামায (সাজ্জাদা), লাঠি (আ'সা), একতারা (রাকওয়া), তাসবিহ্, টুপি, অযুর পাত্র, জুতা ইত্যাদির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সুফি খিরকা সমূহের মধ্যে একদিকে পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন বিদ্যমান তেমনি এগুলো সুফি সাধকদের শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক অগ্রগতির প্রতীক। এগুলো শুধু একজন ব্যক্তির সাধনা জনিত সম্মান ও মর্যাদার স্মারকই নয় বরং সুফি-শিষ্যদের সাধন কর্মে উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জনে উৎসাহদায়ীও বটে। তবে খিরকা সুফি মোকামের মর্যাদা নির্দেশক স্মারকের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু। আধ্যাত্মিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য একজন মাত্র মুরশিদ থেকে খিরকা লাভ করতে হবে সুফি ধারায় এরকম কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। খিরকার ব্যাপারে এরকম শর্তারোপ কেউ কোনোদিন করেন নি। খিরকা প্রদানের আনুষ্ঠানিকতা একজন মুরশিদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার একটা সাধারণ নিয়ম ও আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার একটা প্রথাগত পদ্ধতি। মধ্যযুগের সুফি সমাজে ব্যাপকভাবে এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে,

একজন ব্যক্তি মানুষের জীবনে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক আদান প্রদানের বিভিন্ন মাত্রা ও স্তর রয়েছে। এজন্য এটা বিশ্বাস করা হতো যে, খিরকা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তার আধ্যাত্মিক অভিযাত্রায় অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে এবং এগুলোর প্রতিষেধকমূলক অনেক গুণ ও কার্যকারিতা আছে। সুফি খিরকার নামকরণে ব্যবহৃত অক্ষরগুলোর মধ্যেই বিশেষ তাৎপর্য ও ক্ষমতা বিদ্যমান। 'সুফ' (মানে পশম যা দিয়ে সুফিদের খিরকা তৈরি হয়) শব্দের অন্তর্নিহিত এক তাৎপর্য রয়েছে। দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে সুফিদের পশমী পোশাকের যথার্থতা রয়েছে। আম্বিয়া (আ.)-এর পোশাকেও এ বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সাহাবাদের স্বর্ণযুগে বিনয়, সাধনা এবং পরমানুগত্যের জন্যে কোনো কোনো সত্যপন্থী বা সুফি পশমের পোশাক পরিধান করতেন। সুফ শব্দটার মধ্যে তিনটা হরফ আছে। সা'দ, ওয়াও এবং ফা। সা'দ এর মাধ্যমে তিনি আন্তরিক নিষ্ঠা (সিদা), পবিত্রতা (সাফা), দৃঢ়তা (সালাবাত), ধৈর্য (সবর), সাধুতা (সালাহ্‌); ওয়াও-এর মাধ্যমে আনুগত্য (ওয়াফা), একত্বতা (ওয়াসল), জজ্‌বা (অজদ); এবং ফা-এর মাধ্যমে দুঃখ হতে মুক্তি (ফারাজ) ও জীবন আনন্দ (ফারাহ্‌) লাভ করেন। 'কিতাব আল-তুরুক ফি মা'রিফাত আল খিরকা' নামক গবেষণালব্ধ গ্রন্থে খিরকা শব্দের প্রতীকী ব্যঞ্জনা ব্যক্ত করা হয়েছে। শব্দটা খা, রা, ক্বফ এবং হা-এ চার হরফ দিয়ে গঠিত। খা দিয়ে বস্তুগত পৃথিবীর ধ্বংসের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে (আল ইকবাল আ'লা খারাব আল দুন্‌য়া), রা দিয়ে ক্বলবের রিয়াজত (রিয়াজাত আল-ক্বলব) এবং নফ্‌সে আম্মারার খায়েশ পূরণে অসম্মতি (রফ্‌দ্‌ হুজুজ আল নফ্‌স); ক্বফ দিয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে ক্বলবের আ'দব (ক্বায়দাত আল ক্বলব ফি আল-কুরব মা'আ আল রব), হা দিয়ে বস্তুগত জগতের প্রতি বীতরাগ (হাওয়ান আল দুন্‌য়া) এবং আল্লাহ্‌র পানে অভিযাত্রা (হারব ইলা আল্লাহ্‌ তা'আলা) বোঝানো হয়েছে। মধ্যযুগে ইরাক ও ইরানে সুফি কার্যক্রমে হযরত আবু আল নাজিব আল সোহরাওয়ার্দি (র.)'র প্রভাব অত্যধিক। তিনি হলেন শায়খ হযরত শিহাবুদ্দিন আবু হাফ্‌স উমর আল-সোহরাওয়ার্দি (ক.)-এর চাচা। সুফি খিরকার আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে তিনি অতীব সচেতন ছিলেন। সামা চলাকালীন জজ্‌বার হালতে কোনো আধ্যাত্মিক সুফির ছুঁড়ে দেয়া খিরকার যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে তিনি তাঁর 'আদব আল মুরিদিন' কিতাবে আলোচনা করেছেন। তিনি জজ্‌বা হালতে নিক্ষিপ্ত খিরকার যথাযথ বিতরণের ব্যাপারে একজন অজ্ঞাতনামা সুফির মতামত সম্পর্কে বলেন: তা বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে না দিয়ে বরং ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিভিন্ন টুকরো উপস্থিত সব লোককে দেয়া উচিৎ। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় খিরকার একটা আধ্যাত্মিক মূল্যমান বা বরকত রয়েছে। এটা আশ্চর্য নয় যে, খিরকার এ ধরনের বিচ্ছিন্ন টুকরোই খিরকা-ই মুরাক্কা'আ (তালিযুক্ত খিরকা) তৈরির উপাদান হিসেবে

ব্যবহৃত হতে পেরেছে। মুরাক্কা'আ শব্দটার মধ্যে রয়েছে চার হরফ: মীম, রা, ক্বফ ও 'আইন। মীমের মাধ্যমে একজন সুফি সাধক মা'রিফাত, মহব্বত ও মাদালাত (বিনয়); রা-এর মাধ্যমে করুণা (রা'ফাত), ক্ষমা (রহমত), কৃচ্ছ্রতা (রিয়াজত), শান্তি ও স্বস্তি (রা'হাত); ক্বফ-এর মাধ্যমে পরিতৃপ্তি (ক্বানা'আত), আল্লাহ্‌র নৈকট্য (কুরবত), আত্মিক শক্তি (কুওত-ই-হাল) এবং সত্যবাদিতা (কওল-ই-সিদক); 'আইন দ্বারা ধর্মীয় জ্ঞান (ইলম), ইশক, পরিপূর্ণ আগ্রহ (উলু-ই-হিম্মত), অঙ্গীকারের প্রতি আনুগত্য (আহদ-ই-নিকু) লাভ হয়।

সুফি ধারার ইতিহাসে খিরকার ব্যবহার বা উপকারিতা নিয়ে অনেক বস্তুনিষ্ঠ ঘটনা আছে। যেমন, দজলা নদীতে হযরত মনসুর হাল্লাজ-এর ভস্ম ফেলে দেয়ার পর উত্তাল উর্মি-মাতাল নদীকে শান্ত করার লক্ষ্যে তাঁর ব্যবহৃত খিরকা নিক্ষেপ করে (কোন কোন ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে খিরকা প্রদর্শন করা হয়েছিল) বাগদাদকে বন্যার করাল গ্রাস হতে রক্ষা করা হয়েছিল। ঘটনাটি ছিল, ঐশী প্রেমরাজ হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.)'র শাহাদাতের পর প্রতিটি রক্তকণিকা এবং টুকরো টুকরো করা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 'আনাল হক' উচ্চারণে যখন আকাশ বাতাস মুখরিত হচ্ছিল তখন বাগদাদের বাদশাহ্‌র নির্দেশে তাঁর টুকরো করা দেহ জড়ো করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। তখন প্রতিটি ভস্ম রেণু হতে একযোগে 'আনাল হক' শব্দ উত্থিত হতে শুরু করে। বাদশাহ্‌র নির্দেশে তখন হযরত মনসুর হাল্লাজের দেহভস্ম দজলা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। দেহভস্ম নদীতে নিক্ষেপের পর দজলা ভীষণ ভয়ংকর রূপ নিয়ে বাগদাদ নগরী ডুবিয়ে দিতে উদ্যত হয়ে উত্তাল অবস্থার সৃষ্টি করে। এ ধরনের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে দজলার তীরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত হযরত মনসুর হাল্লাজের বিশ্বস্ত এক খাদেম-মুরিদ পীরের পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী মনসুরের খিরকাটি দজলা নদীকে প্রদর্শন করলে আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতে উত্তাল দজলা নদী মুহূর্তেই শান্ত হয়ে যায়। এতে বুঝা যায় আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রকৃতিও খিরকা চিনে এবং এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব বুঝে। ভারতীয় এক কাহিনী মতে, শাহ্ সুফি নিজাম আল দীন আবু আল মূঈদ-এর মৃত মায়ের পরিধেয় বস্ত্রের বরকতে ভারত খরা থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার

> "স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তখন আল্লাহ্ বললেন, নিশ্চয় আমি যা জানি তা তোমরা জান না" (সূরা বাক্বারা, আয়াত : ৩০)।

উত্তরাধিকারত্ব যার হাতে ন্যস্ত হয় তাকে খলিফা বা প্রতিনিধি বলা হয়। আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারত্ব প্রদানের বা সিলসিলার শিক্ষা স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন হতে এসেছে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাঁর সৃষ্টি জগতের প্রথম প্রতিনিধি বা খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন হযরত আদম (আ.)-কে। আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর, নবী, রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, যারা সকলেই আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োগকৃত ও দীক্ষিত। যেহেতু আল্লাহ্‌র দ্বীন বা ধর্মের প্রচারক কে হবেন সেটি আল্লাহ্ই ভাল জানেন এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন বা ধর্মের তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ্ নিজেই, সেহেতু আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বা খলিফা আল্লাহ্ নিজেই নিযুক্ত করেন এবং এ ব্যাপারে তিনিই একমাত্র ক্ষমতাবান। এতে অন্য কোনরূপ হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই। তাই আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতায় কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা সংখ্যাগরিষ্ঠের বুদ্ধিমত্তা (ইজমা) বা প্রদর্শিত বা উপস্থাপিত যুক্তি অবতারণা করার অবকাশ নেই। অনুরূপভাবে রাসূল বা নবীদের প্রতিনিধি/খলিফা/আল্লাহ্‌র অলিদের নির্দিষ্ট কোন দায়িত্বে নিযুক্তিতে আল্লাহ্‌র একই নিয়ম প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ তাঁরাও আল্লাহ্ তা'আলার দ্বারাই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বপ্রথম খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। উক্ত আয়াতে হযরত আদম (আ.)-কে সর্বপ্রথম খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ পাক এতে বলেন নাই যে, ওহে ফেরেশ্‌তা তোমরা যেহেতু পাপমুক্ত, সর্বদা আমার বন্দেগিতেই মগ্ন থাক, তোমরা নিজেরাই ইজমা বা পঞ্চায়েত করে তোমাদের মনোনয়নে কাউকে খলিফা বা প্রতিনিধি নির্বাচন করে নাও যে কিনা আমার উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করবে। এও বলেন নি যে, আমি দুনিয়াবাসীদের মনোনয়নে খলিফা বা প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দিব, আবার এও বলেন নি যে, লোকে যাকে তাদের খলিফা বা প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে আমি তাই সমর্থন করে নিব। বরঞ্চ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ পদ্ধতিগুলো ত্যাগ করে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে,

আমি স্বয়ং দুনিয়াতে খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করব। উপরোক্ত আয়াতে 'ইন্নি জায়িলুন' শব্দের তাৎপর্য হল আমিই নিযুক্ত করব। ইন্নি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত নিয়োগ পদ্ধতি কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগে আল্লাহ্‌রই প্রত্যক্ষ ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ নবুয়ত যুগ পরবর্তী আল্লাহ্‌র অলিগণও একই পদ্ধতিতে সরাসরি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন, যদিও বা তাদের পীর বা মুর্শিদ হতে খেলাফতের স্বীকৃতি প্রাপ্তির পদ্ধতি দুনিয়াবী দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পীর বা মুর্শিদের ইচ্ছাধীন মনে হয়। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই আওলিয়াগণের মাধ্যমে পৃথিবী পরিচালিত হবে। সৃষ্টিকুল পরিচালনার আসনে উত্তরাধিকারসূত্রে কারা বসবেন সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কোরআনে পাকে বলছেন,

> "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই নিরাপত্তা প্রদান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরিক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী" (সূরা নুর, আয়াত : ৫৫)।

> "হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করো রাসূলের আর সেই সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ্ ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো। এটিই একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট" (সূরা নিসা, আয়াত : ৫৯)।

আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব

> হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করিম (দ.) বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তাকে শক্ত করে ধরে রাখ, তবে আমার পরে তোমরা আর কখনো গোমরাহ্ হবে না। তার মধ্যে একটি আরেকটি অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো, আল্লাহ্র কিতাব, তা একটি লম্বা রশি সদৃশ। যা আকাশ হতে জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত। আর দ্বিতীয়টি হলো, আমার আপন আহলে বাইত। এ বস্তু দুটি কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। অবশেষে তারা হাউজে কাওসারে আমার সাথে মিলিত হবে। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করছ তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। [হযরত রাসূলে করিম (দ.)-এর আহলে বাইত হলেন হযরত আলী (রা.), হযরত মা ফাতিমা (রা.), হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হোসাইন (রা.) এবং তাঁদের বংশধরগণ] [তিরমিযী]।

আহলে বাইতগণ হলেন হযরত রাসূলে করিম (দ.)-এর অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব হল হযরত রাসূলে করিম (দ.)-এর রিসালতের মূল উৎসধারা, যা ইসলাম ধর্মের আধ্যাত্মিক কীর্তি ও গোপন করুণাধারাকেই শুধু সুরক্ষা দেয়নি বরং হযরত রাসূলে করিম (দ.)-এর আধ্যাত্মিকতা থেকে উৎসারিত রহমতের স্বরূপকেও মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছে। আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্ব সুফিসুলভ নিষ্কলুষতা ও পুনর্গঠনের ঝরণাধারা এখান থেকেই উৎসারিত। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এর বর্ণনা মতে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার উত্তরাধিকার গ্রহণকারী মানুষদের মধ্যে তিনটা শ্রেণি রয়েছে– প্রথম শ্রেণি হলেন যারা তাঁর থেকে প্রজ্ঞা, পুণ্যশীলতা ও রূহানী ফয়েজ লাভ করেছেন। এরা হলেন আহলে বা'ইত এবং বিশিষ্ট মর্যাদাশীলগণ।

দ্বিতীয় শ্রেণি হলেন যাঁরা নবী করিম (দ.)-এর প্রকাশ্য অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁরা পেয়েছেন পুণ্যশীলতা, ধর্মীয় নির্দেশাবলী ও প্রকাশ্য হেদায়াত। এরা হচ্ছেন তাঁর সাহাবী। খোলাফায়ে রাশেদিনের পাঁচ খলিফা ও বেহেশ্তের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী।

তৃতীয় শ্রেণি হলেন যাঁরা নবী করিম (দ.)-এর কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান ও ধার্মিকতা লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের অহমকে পুরোপুরি বর্জন করতে সক্ষম

হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মত বিশিষ্ট সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তী বুযুর্গগণ।

এই তিন ধরনের উত্তরাধিকারের উৎসস্থল হচ্ছে খতমে নবুয়ত (আত্ তাফহিমাত্-উল ইলাহিয়া, কৃত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্)। রাসূলে করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা, আদর্শ ও রহমতের প্রচারণা দুনিয়ায় শেষ দিন পর্যন্ত জারী রাখার লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ধারণকারী প্রথম ব্যক্তি হলেন হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের সাথে আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্ব ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্ব তথা বেলায়তের প্রমাণ হচ্ছে রাসূলে করিম (দ.) এর ঘোষণা। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (দ.) দুনিয়া হতে পর্দান্তরিত হওয়ার পর এই বেলায়ত অলিয়ে কামেলদের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত থাকে এবং সর্বপ্রকার বেলায়ত বিশেষতঃ বেলায়ত বিল অরাছত ইমামুল আওলিয়া হযরত আলী মরতুজা (রা.) এর ব্যক্তিত্বে কেন্দ্রীভূত হয়। ইমামুল আওলিয়া হযরত আলী (রা.) নিজ দেহ প্রাণকে রাসূলে করিম (দ.) এর দেহ ও প্রাণের বিনিময়ে হিযরতের সময় হযরত রাসূলে করিম (দ.) বিছানায় তাঁর চাদর মোবারক আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতঃ প্রেম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হযরত রাসূলে করিম (দ.) এর আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি যা নবুয়তে সুপ্ত ছিল সেটি হযরত আলী (রা.) এর জাতে পাকে প্রস্ফুটিত হয়েছে। হযরত আলী (রা.)-এর বাণীর দ্বারাও এটি প্রমাণিত হয়। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, “আমি মহা প্রতাপশালীর নিয়ন্ত্রণে রাজী হয়েছি, আমার ভাগে এলম বা জ্ঞান এবং আমার বিপক্ষের ভাগে ধন ঐশ্বর্য পড়েছে”। হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে হযরত রাসূলে করিম (দ.) এর অনন্ত গৌরবময় বেলায়তী অভিযানের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে “আমি ইলমের শহর বা হেকমতের ঘর এবং আলী এর দরজা” অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের দ্বারোদঘাটক বা আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের সুবর্ণ ফটক সর্বপ্রথম উন্মোচন করেছেন হযরত আলী (রা.)। তাই ত্বরিকতের সকল সিলসিলাসমূহের উৎসমূলে রয়েছেন হযরত আলী (রা.)।

খিরকা কী

খিরকা আরবী শব্দ, যার অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। পারিভাষিক অর্থে সুফিগণ কর্তৃক পরিধেয় পুরু পশমী চাদরকে খিরকা নামে অভিহিত করা হয়। কারণ প্রথম দিকে সুফিদের চাদর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড জোড়া দিয়ে প্রস্তুত করা হত। এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'মুরাক্কা' (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডের সমন্বয়ে প্রস্তুত চাদর)। হযরত সৈয়দ আবুল হাসান আলী দাতা গঞ্জে বখ্‌শ হাজবেরী (র.) তাঁর 'কাশ্‌ফ আল-মাহজুব' গ্রন্থে বলেছেন, "সুফি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার অন্তরে খিরকা অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রেমের জ্বালা ও আগুন রয়েছে। সেই ব্যক্তি সুফি নয় যার শুধু পরিধানে খিরকা অর্থাৎ দরবেশী লেবাস রয়েছে।" পূর্বকালে খিরকা সুফিদের দারিদ্র্য ও পরিতুষ্টির বাহ্য নিদর্শন ছিল। প্রথমদিকে এটি সাধারণত নীল রঙ-এর হতো। উল্লেখ্য যে, নীল রঙ হচ্ছে শোকের প্রতীক। পূর্বকালে খিরকা সুফিদের সাধারণ লেবাস হিসেবে পরিগণিত ও পরিহিত হলেও কোন কোন তাসাওউফপন্থী লোক বিশেষ ধরনের কোন লেবাস পরিধান করা পছন্দ করতেন না। তাঁরা বলতেন, "আল্লাহ্ প্রাপ্তির সাধারণ পথে এইরূপ স্বাতন্ত্র্য জ্ঞাপক চিহ্ন গ্রহণ করা নিরর্থক। কারণ প্রত্যেক মানুষের অন্তরের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তমরূপে অবগত আছেন। অন্য কথায় বলা যায়, যদি মানুষকে জানানোর উদ্দেশ্যে তাসাওউফপন্থী ব্যক্তি খিরকা পরিধান করে, আর সে ব্যক্তি যদি প্রকৃতই তাসাওউফপন্থী হয়ে থাকে, তবে ত ওটা নিছক অপ্রয়োজনীয় একটি চিহ্ন ও নিদর্শন বৈ কিছু নয়। আর যদি সে ব্যক্তি একজন কপট তাসাওউফপন্থী হয়ে থাকে, তবে তার উক্ত লেবাস নিছক রিয়াকারী ও প্রদর্শনী ভিন্ন অন্য কিছু নয়। পূর্বকালে নিয়ম ছিল কোনও শিক্ষানবিশ তাসাওউফপন্থী ব্যক্তি যতদিন পর্যন্ত না তার শিক্ষা গ্রহণের তিন বৎসর আবশ্যিকভাবে পূর্ণ করতেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি খিরকা লাভ করতে পারতেন না। কোনও মুরীদকে তার শায়খ কর্তৃক খিরকা প্রদানকালে একটি প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হত। তাসাওউফের শায়খ হযরত শিহাবুদ্দিন আবু হাফ্‌স উমর আল-সোহরাওয়ার্দি (ক.) তাঁর 'আওয়ারিফ আল-মা'রিফ' গ্রন্থে লিখেছেনঃ "খিরকা পরিধান এই কথা বলে দেয় যে, এটির পরিধানকারী ব্যক্তি সততার পথ অর্থাৎ তাসাওউফের ত্বরিকা গ্রহণ করেছে। এটি এই কথাও বলে দেয় যে, খিরকা পরিধানকারী ব্যক্তি তার অহংকার ও দম্ভ পরিত্যাগপূর্বক নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শায়খ-এর নিকট সমর্পণ করে দিয়েছে।" [ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ]

খিরকার প্রকারভেদ

এক. খিরকাতুল ইরাদা **দুই.** খিরকাতুত্ তাবার্রুক।

খিরকাতুল ইরাদা হচ্ছে সেই খিরকা, যেটি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আগ্রহী মুরিদের অন্তরে তাসাওউফের পথে চলার অনুভূতি ও আগ্রহ সক্রিয় থাকে। খিরকাতুল ইরাদা মুর্শিদ কর্তৃক প্রকৃত ও যোগ্য উত্তরসূরীকে প্রদান করা হয়। খিরকাতুল ইরাদা হচ্ছে স্বাধীন ইচ্ছা সম্ভূত অর্থাৎ এটি প্রাপ্তিকালে মুরিদের অন্তরে এই বিষয়ে পূর্ণ অনুভূতি বিদ্যমান থাকে যে, এটি প্রাপ্তির পর আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে তার প্রতি সৃষ্টিজগত পরিচালনার দায়িত্ব আসছে এবং এই খিরকা গ্রহণের মাধ্যমে মুরিদ নিজেকে শায়খের আদেশের পূর্ণ অনুগত করে নিচ্ছে। এটি মুরিদকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়।

খিরকাতুত্ তাবার্রুক প্রকৃতিগতভাবে খিরকাতুল ইরাদার মতই। অবশ্য এটি অনেকটা অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়। এটি আশীর্বাদসূচক খিরকা অর্থাৎ তাসাওউফের শায়খ তার ত্বরিকাগত অবস্থান হতে বরকত ও দু'আর নিদর্শন হিসেবে সেই মুরিদকে স্বেচ্ছায় প্রদান করে থাকেন, যার সম্বন্ধে শায়খ ধারণা ও আশা করেন যে, তাকে তাসাওউফের জগতে প্রবেশ করালে সেটি মুরিদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। এটা শুধুমাত্র বাহ্যিক উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রদান করা হয় না। সুফি বা মুর্শিদের পক্ষ হতে এটা অপেক্ষাকৃত নবীন সুফি বা মুরিদকে প্রদান করা হয়। (কাশ্‌ফ আল-মাহজুব)

সুতরাং স্পষ্টতই বুঝা যায় প্রথম প্রকারের খিরকা (খিরকাতুল ইরাদা) দ্বিতীয় প্রকারের খিরকা (খিরকাতুত্ তাবার্রুক) অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। এতদ্ব্যতীত এটি প্রকৃত সুফিদেরকে সেই সকল খিরকাধারীগণ হতে পৃথক করে দেয়, যারা শুধু বাহ্য আকৃতির দিক দিয়ে তাদের সাথে মিল ও সাদৃশ্য গ্রহণ করে। (E. Blochet, Ftudes sur l'esoterisme musulman, Museon সাময়িকী, ১৯০৯ খৃ. ১০ সংখ্যা, পৃ. ১৭৬)

মধ্য যুগের ইরানের সুফি লেখক শায়খ আবু-আল মাকারিম রুকন-উদ-দ্বীন আলা উদ-দৌলা আহমেদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বায়াবাঙ্কী সিমনানী (র.), তিনি আলা উদ-দৌলা সিমনানী (১২৬১ খ্রি.–১৩৩৬ খ্রি.) নামেই পরিচিত। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায় নিজ পীর হযরত নুর আদ-দ্বীন ইসফারাইনি (র.)-এর নিকট থেকে কয়েক প্রকারের খিরকা অর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন, এগুলো হল:

১. **খিরকায়ী মুলাম্মা'আ (বিভিন্ন বাহারি রঙের ছোপযুক্ত খিরকা):** ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলা উদ-দৌলা সিমনানী তাঁর পীর হযরত নুর আদ-দ্বীন ইসফারাইনি (র.) হতে এটি পেয়েছিলেন।

২. **আল খিরকা আল-জাকিরা (জিকিরের খিরকা):** ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলা উদ-দৌলা সিমনানী তাঁর পীর হতে এটি পেয়েছিলেন। তাঁর পীর **১ম** খিরকাটি আলা উদ-দৌলা সিমনানীকে দেওয়ার পর এই খিরকাটি **১০** বছর যাবৎ পরিধান করেছেন। মূলত জিকিরের সময় তিনি এই খিরকাটি পরিধান করতেন।

৩. **খিরকাতুল আ'সি (স্বীকৃতিমূলক খিরকা):** এটি বস্তুগত না অবস্তুগত এ বিষয়টা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। নাকি এটা শুধু মাত্র আলা উদ-দৌলা সিমনানীর সিলসিলাগত সনদের প্রতি ইঙ্গিতবাহী তাও বোঝা যায়নি। এটাও বোধগম্য নয় সিমনানী এমন কোনো খিরকা প্রাপ্তির দাবী করেছেন যা আসলেই নবী করিম (দ.)-এর পূণ্য স্মৃতির সাথে জড়িত। কারণ ইসফারা'ইনি এমন এক খিরকা সিমনানীকে দিয়েছিলেন যাতে নবী করিম (দ.) এর একটা চিরুনি ছিল বলে ধারণা করা হয়। হযরত রাসূলে করিম (দ.) এর সমসাময়িক বলে খ্যাত কিংবদন্তীতুল্য ভারতীয় সুফি আবু রীয়া বাবা রতন এটি নাজিম উদ্দিন কুবরার এক শিষ্য আলী-ই-লালা'র (ওফাত ৬৪২ খ্রি./১২৪৪ খ্রি.) ভারত ভ্রমণকালে দিয়েছিলেন। আলী-ই-লালা থেকে চিরুনিটি আহমদ-ই-গুরপানি (ওফাত ৬৬৯খ্রি./১২৭০ খ্রি.)-র হাতে ও পরে সিমনানীর উস্তাদ ইসফারা'ইনির হাতে আসে। কবি ও সুফি পন্ডিত আবদ-আল-রহমান জা'মীর (ওফাত ৮৯৮ খ্রি./১৪৯২ খ্রি.) কথিত মতে সিমনানী চিরুনিটা খিরকার সাথে পেঁচিয়ে ও খিরকাটা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে রাখতেন। এমনও হতে পারে যে, খোদ চিরুনিটাই গণ্য হয়েছে খিরকা হিসেবে। কারণ খিরকার স্মারক হিসেবে অন্য বস্তুও ব্যবহৃত হবার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং খিরকা বলতে যে পরিধেয় বস্ত্র হতে হবে তা অনিবার্য নয়। ['নাহাফাত আল উন্‌স', মূলঃ নুর আল দীন আবদ আল রহমান জামি, সম্পা: মাহদী তৌহিদীপুর (তেহরান: কিতাব ফুরুশি-ই-সা'দী, ১৯৫৮), পৃ. ৪৩৭]

৪. **খিরকা-ই-হাজার মিখি (অসংখ্য তালিযুক্ত খিরকা):** তেরশ/চৌদ্দশ শতাব্দীতে ইরানী সুফিদের মাঝে বহু তালিযুক্ত খিরকার প্রচলন ছড়িয়ে পড়ে যাকে খিরকা-ই-হাজার মিখি বলে অভিহিত করা হয়। সিমনানি তাঁর পীর ইসফারা'ইনি হতে এ ধরনের খিরকাই লাভ করেছিলেন যা মূলত নাজিম

আল-দীন কুবরার অধিকারে ছিল। তিনি তা পেয়েছিলেন মজিদ আল দীন বাগদাদী হতে। পরে তা আলী-ই-লালাকে দেয়া হয়। এটা বোধ হয় সেই টুপির মতো যাকে খুলা-ই-হাজার-মিখি বলা হয়। কথিত আছে, এটা কুবরার কাছেই ছিল এবং যা ১৩০৫-০৭ সালের দিকে ইসফারা'ইনি তাঁর শিষ্য সিমনানীকে দিয়েছিলেন। সম্ভবত এটা সত্য হতে পারে যে, বহু তালিযুক্ত খিরকা হযরত সৈয়দ আবুল হাসান আলী দাতা গঞ্জে বখ্শ হাজবেরী (র.) কর্তৃক বর্ণিত খিরকা-ই-মুরাক্কা'আরই ফলিত বা সংশোধিত রূপ যা ছোট ছোট তালি দিয়ে বানানো হয়।

হযরত নাজিম উদ্দিন কুবরা (র.) তাঁর রচনাবলীতে উল্লেখ করেছেন, 'কিতাব আল তুরুক ফি মা'রিফাত আল খিরকা' (লেখক অজ্ঞাত) গ্রন্থে চার ধরনের খিরকার কথা উল্লেখ করেছেন।

১. খিরকা-ই তাবার্রুক
২. খিরকা-ই ইরাদাত
৩. খিরকা-ই তাসার্রুফ
৪. খিরকা-ই খিদমত ওয়া সোহবত।

শেষোক্ত দু'প্রকারের খিরকা সুফি মোকাম/স্তর নির্দেশে তেমন কোনো পার্থক্য প্রকাশ করে না।

সুফি খিরকার উৎপত্তির ধারণা

আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদানের স্বীকৃতির স্মারক হিসেবে খিরকার প্রচলন কাহিনী মানুষের আদি ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। এ ধারণার সাথে জড়িয়ে আছে সুফি দৃষ্টিভঙ্গীও যাতে মনে করা হয় খিরকাই প্রকৃত পক্ষে ধর্মীয় পোশাক। হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) পৃথিবীতে অবতরণ করার পর যে পোশাক পরিধান করেছিলেন সে পোশাকের নমুনা থেকে খিরকার ধারণার উৎপত্তি। এ ধরনের কুলজি (pedigree) সুফি খিরকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ সুফি মতে হযরত আদম (আ.) শুধু প্রথম মানবই ছিলেন না তিনি ছিলেন নবুয়তি ধারার প্রথম পুরুষ যে ধারা হযরত রাসূলে করিম (দ.) পর্যন্ত এসে পরিণতি লাভ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। সুফি দর্শন মতে, হযরত মুহাম্মদ (দ.) হচ্ছেন ইসলামের আইন-বিধান জারি ও নির্ধারণের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি (মহান স্রষ্টার পক্ষ হতে) এবং তিনিই হচ্ছেন প্রথম সুফি, সুফি ধারার সকল ত্বরিকার উৎসস্থল তিনিই। (Introduction to Sufism: The Inner Path of Islam, by Eric Geoffroy).

মধ্যযুগে, আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ ঘটতো প্রতীকী ঘটনার মাধ্যমে দুই পদ্ধতিতে। এক, (মুর্শিদ বা পীরের) হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ, যাকে বলা হত 'আহদ আল-ইয়াদ ওয়া আল-ইকতিদা' এবং দুই, খিরকা গ্রহণের মাধ্যমে যাকে বলা হত 'আহদ আল-খিরকা'। সুফি খিরকা গ্রহণের মাধ্যমে সুফি ত্বরিকায় দীক্ষা গ্রহণ বিষয়ে আদি লেখক আল কোরাইশি পাঁচটি মাধ্যমের (ত্বরিকার) উল্লেখ করেছেন: (১) হযরত আবদুল কাদির আল জিলানী (ক.)-এর ত্বরিকা, (২) হযরত আহমদ আল রিফায়ি (ক.)-এর ত্বরিকা, (৩) হযরত শিহাবউদ্দিন আল সোহরাওয়ার্দি (ক.)-এর ত্বরিকা, (৪) হযরত আবু মাদইয়ান আল শুয়াইব (ক.)-এর ত্বরিকা এবং (৫) হযরত আবু ইসহাক আল কাজুরুনি (ক.)-এর ত্বরিকা। [অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র আল কাওয়াইদ আল ওয়াফিয়া ফিসাল হুকুম আল খিরকাত আল সুফিয়া (লুই ম্যাসিগনন: দ্য প্যাশন অব হাল্লাজ, অনুবাদ: হার্বার্ট ম্যাসন: বলিনজেন সিরিজ নং ৯৮ (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮২)]।

তাগি আল-দীন আবদ আল রহমান আল ওয়াসিতি (ওফাত ৭৪৪ খ্রি./১৩৪৩ খ্রি.) তাঁর রচিত 'তিরইয়াক আল মুহিব্বীন ফি তাবাগাত খিরকাত আল মাশায়িক আল আরিফিন' গ্রন্থে মধ্যযুগের সুফি সিলসিলার সাংগঠনিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে খিরকা সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের বক্তব্য পেশ করেছেন।

সুফি সাহিত্যের কিছু ধ্রুপদী বইতে খিরকার গুরুত্ব সম্পর্কে বেশ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেমনঃ হযরত সৈয়দ আবুল হাসান আলী দাতা গঞ্জে বখ্শ হাজবেরী (ক.) তাঁর 'কাশ্ফ-আল-মাহজুব' এবং হযরত শিহাবুদ্দিন আবু হাফ্স উমর আল-সোহরাওয়ার্দির (ক.) 'আওয়ারিফ আল-মা'রিফ' গ্রন্থে।

'আওয়ারিফ আল-মা'রিফ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, খিরকা হচ্ছে মুরশিদ ও মুরিদের মাঝে বন্ধনের প্রতীক। এটা পূর্ব যুগের নবীদের ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁকে নমরুদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। তাতে তাঁর পরিহিত কাপড় পুড়ে গিয়েছিল। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম সে সময় বেহেশ্ত হতে একটা জামা (কামিজ সদৃশ) এনে তাঁকে দিয়েছিলেন, যেটি তৈরী করা হয়েছিল বেহেশ্তি রেশম (হারির আল-জান্নাহ) দিয়ে। ওফাতের সময় এ জামা তিনি হযরত ইসহাক (আ.)-কে দিয়েছিলেন। হযরত ইসহাক (আ.) তাঁর ওফাতের সময় একইভাবে সে জামা হযরত ইয়াকুব (আ.)-কে দিয়ে যান। তিনি তা তাবিজ বানিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গলায় পরিয়ে দেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর ভাইয়েরা যখন কূপে নিক্ষেপ করে তখন তারা তাঁর পোশাক খুলে নিয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শরীরে পোশাক না দেখে তাঁর গলার তাবিজ খুলে জামাটি তাঁকে পরিয়ে দেন।

বেহেশ্তি রেশমি জামার এ কাহিনী সত্ত্বেও সুফিগণ পশমী পোশাককেই অধিকতর পছন্দ ও উত্তম মনে করেন। হযরত রাসূলে করিম (দ.) বর্ণিত অনেক হাদিস শরিফে বিভিন্ন নবী (আ.) কর্তৃক পশমী পোশাক পরিধানের কথা বলা হয়েছে। হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) যখন দুনিয়াতে অবতরণ করেন তখন তাঁদের পোশাক তৈরির জন্য হযরত জিবরাঈল (আ.) একটা ভেড়া নিয়ে আসেন। এর চামড়া দিয়ে হযরত হাওয়া (আ.) তাঁদের উভয়ের জন্য খিরকা তৈরি করেন বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

আধ্যাত্মিক অবস্থানের স্তর নির্ণয়ে সুফি খিরকার রঙয়ের তাৎপর্য

সুফি খিরকা আধ্যাত্মিক সাধনায় একজন সুফি ব্যক্তির উৎকর্ষতার মানক্রমের প্রতীক। হযরত নাজিম আদ-দীন কুবরা (র.) সুফিদের আধ্যাত্মিক অবস্থানের স্তর বিন্যাসের প্রতীক হিসেবে খিরকার রঙকে বাছাই ও বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি একজন সুফি সাধকের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ক্রম অগ্রগতির স্তর নির্ধারণের প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন খিরকাকে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে সুফিদের মূল খিরকার রঙ কালো অথবা গাঢ় নীল। এ রঙের পোশাকের তাৎপর্য হচ্ছে, পরিধানকারী নিজের নফ্‌সে আম্মারা (মন্দ প্ররোচনা দানকারী প্রবৃত্তি)-কে জয় করেছেন এবং পরিণতিতে কালো রঙের মাধ্যমে প্রতিকী শোক পালন করছেন। একজন সুফি সাধক তাওবা (অনুশোচনা) করে যখন পরিশুদ্ধ হন তখন সাদা রঙের খিরকা পরিধান করেন। এ সাদা রঙ তাঁর মনের স্বচ্ছতা ও শুভ্রতার প্রতীক। এতে মনে করা হয় তিনি দুনিয়ার যাবতীয় উদ্বেগকে পরিত্যাগ করেছেন। বস্তুগত দুনিয়ার ঊর্ধ্বে উঠে তিনি যখন তাঁর আধ্যাত্মিক অভিযাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং ভাবজগতে বিচরণ করেন তখন তিনি নীল রঙের খিরকা পরিধান করেন, যে রঙ আকাশ নিজে ধারণ করে আছে। আর কোনো সুফি সাধক যদি আধ্যাত্মিকতার সকল মোকাম (স্তর) হয়ে আধ্যাত্মিকতার সকল সার নির্যাসকে আত্মস্থ করেন তখন তিনি সর্ব রঙের বিচিত্র সমাহারপূর্ণ খিরকা (খিরকা-ই-মুলাম্মা'আ) পরিধান করেন। হযরত নাজিম আদ-দীন কুবরার (র.) মুরিদ হযরত আবু আল মাফাখির ইয়াহিয়া বাখারজি (র.) তাঁর 'আওরাদ আল আহবাব ওয়া ফুসুস আল-আদাব' গ্রন্থে খিরকা সম্পর্কে একই স্তর বিন্যাস উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি কালো রঙের পশমী পোশাকের ব্যবহারকে হযরত আদম (আ.)-এর সাথে সম্পর্কিত বলে বর্ণনা করেছেন। যিনি প্রধান ফেরেশ্‌তা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পরামর্শ অনুযায়ী নিজের তৎকালীন অবস্থায় অনুতপ্ত হয়ে কালো রঙের পোশাক অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। হযরত ইয়াহিয়া বাখারজি সাদা ও নীল রঙের খিরকা সম্পর্কেও যথাযথ আলোকপাত করেছেন। তিনি নীল রঙধারী সুফিদেরকে বস্তুজগতের বাইরে বিচরণকারী বলে বর্ণনা করেছেন। সাদা ও হালকা রঙ গাঢ় রঙের চেয়ে অতি তাড়াতাড়ি ময়লাযুক্ত হয়ে পড়ে। আবার এসব রঙ অন্য সব সাধারণ মানুষকেও আকৃষ্ট করে। আবার নীল রঙ সাধারণত শোকেরও প্রতীক। কারণ সুফিদের ধারণা আমাদের বস্তুজগত প্রকৃতপক্ষে শোক প্রকাশের জায়গা কারণ মানুষ এখানে এসে আল্লাহ্‌ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাঁরা তাই স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্নতার বেদনায় ভোগেন। এক দরবেশের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কেন তিনি নীল রঙের পোশাক পরেন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন:

“হযরত রাসূলে করিম (দ.) তিন ধরনের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন: দারিদ্র, জ্ঞান এবং তলোয়ার। ক্ষমতাবান শাসকরা তলোয়ারকে গ্রহণ করেছেন, যারা এর অপব্যবহার করেন। পণ্ডিতরা গ্রহণ করেছেন জ্ঞানকে, যাঁরা শুধু এটা অন্যকে শিক্ষাদানের কাজে ব্যবহার করে সন্তুষ্ট থাকেন। আর দারিদ্রকে বেছে নিয়েছেন সুফিরা। যাঁরা এটাকে এ তিন শ্রেণীর বিপর্যয়ের জন্য শোক হিসেবে বরণ করে নেন।”
হযরত সৈয়দ আবুল হাসান আলী দাতা গঞ্জে বখ্‌শ হাজবেরী (র.) বলেছেন, “একজন সুফি যদি তাঁর ভেতরে ও বাইরে নিরাপত্তার মোহর লাগাতে পারেন এবং তাঁর অন্তরকে বানাতে পারেন গোপন রহস্যের ভাণ্ডার তখন তিনি তাঁর খিরকার ওপর জরির একটা বিনুনি করেন। যখন তিনি ভালোবাসার সিংহাসনে আরোহণ করেন, জ্ঞানের আসনে বসে পরিশ্রান্তি বিদূরিত করেন আর আল্লাহ্‌র নির্দেশকে নতমস্তকে মেনে নেন তিনি তখন খিরকায় একটা আঁচল সেলাই করে নেন। যদি তিনি নফ্‌সে আম্মারা ও সকল শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার বর্ম পরিধান করেন, আর মাথায় ধারণ করেন ক্ষণস্থায়ী সকল ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের হেলমেট তখন তিনি গলবন্ধনীকে শক্ত করে নেন।”

নবী [আ.] গণের খিরকা সম্পর্কিত বর্ণনা

হযরত আইয়ুব (আ.) এর চাদর –	২৬
হযরত ইবরাহিম (আ.) এর পাগড়ি –	২৭
হযরত ইউসুফ (আ.) এর খিরকা –	২৮
হযরত ঈসা (আ.) এর চাদর –	৩১

হযরত আইয়ুব (আ.) এর চাদর

"স্মরণ কর, আমার বান্দা আইয়ুবকে, যখন সে তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।' আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়। আমি তাকে দান করলাম তাঁর পরিবারবর্গ ও তাদের মত আরও, আমার অনুগ্রহস্বরূপ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ" (সূরা সোয়াদ, আয়াত : ৪১-৪৩)।

হযরত আইয়ুব (আ.) রোগমুক্তির জন্য করুণার আধার আল্লাহ্ তা'য়ালার কৃপা ও করুণারাশি প্রাপ্তির আশায় তাঁর দরবারে কাঁদতে লাগলেন, যেন তাঁর অশ্রুধারায় জমিন ভিজে যাচ্ছিল। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ্র দরবারে আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। এখন আপনি উঠে বসুন।' হযরত আইয়ুব (আ.) বললেন, 'হে জিবরাঈল! আমি কেমন করে উঠে বসব বলুন। রহিমার সাহায্য ব্যতীত আমি পার্শ্বও পরিবর্তন করতে পারি না। আর আপনি কিনা আমাকে উঠে বসতে বলছেন?' তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি সাহস করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করুন। এরপর আল্লাহ্ আইয়ুব (আ.)-কে আদেশ দিলেন যমিনের উপর পা দিয়ে সজোরে আঘাত করার। হযরত আইয়ুব (আ.) যমিনের উপর পা দিয়ে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফেটে ঝরণার সৃষ্টি হল। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে অনুরোধ করলেন ঝরণা হতে গোসল করতে এবং পানি পান করতে। হযরত আইয়ুব (আ.) গোসল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেল। তাঁর শরীরে রোগের কোন চিহ্নমাত্র থাকল না। অতঃপর তিনি ঝরণা হতে সুশীতল পানি তৃপ্তি সহকারে পান করলেন, ফলে তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা একেবারে দূর হয়ে গেল। তিনি এইবার সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেলেন। তাঁর শরীরে যথেষ্ট শক্তি অনুভব করলেন। তাঁর দেহে দিব্যি স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ফিরে আসল। এই সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) বেহেশ্ত হতে একটি চাদর এনেছিলেন। সেটি হযরত আইয়ুব (আ.) এর হাতে দিলেন এবং তিনি পরিধান করলেন। বিপদে ধৈর্যধারণ করায় এবং আল্লাহ্র পরীক্ষাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ায় আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আইয়ুব (আ.)-কে ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে প্রশংসা করেন, "আমি তো তাঁকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী" (সূরা সোয়াদ, আয়াত : ৪৪ আয়াতাংশ)।

হযরত ইবরাহিম (আ.) এর পাগড়ি

> "আর তিনি (হযরত ইয়াকুব আ.) বললেন, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা সবাই এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারি না। হুকুম আল্লাহ্‌রই। আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তাদের আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করা উচিৎ" (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৬৭)।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইগণ পিতার নির্দেশনা মোতাবেক কেনান হতে ভিন্ন ভিন্ন শহরের পথ ধরে মিসরে গমন করেন এবং আলাদা আলাদা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। কেনান হতে বিদায়কালে হযরত ইয়াকুব (আ.) উত্তরাধিকার স্বত্বে প্রাপ্ত হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর একটি পাগড়ি মোবারক ছেলেদের হাতে দেন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে হাদিয়া প্রদানের জন্য। হযরত ইউসুফ (আ.) পিতৃপ্রদত্ত পাগড়ি পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিলেন। কেননা, এ পাগড়িপ্রাপ্তির অর্থ ছিল নবুয়তের মর্যাদায় সমাসীন হওয়া।

হযরত ইউসুফ (আ.) এর খিরকা

> “তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রাখবে; তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমরা পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে আমার নিকট চলে আসিও” (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৯৩)।

পবিত্র কোরআন শরিফে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যে খিরকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেটি ছিল বরকতময় এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতিসূচক খিরকা। এই জামা বা খিরকাটি হযরত জিবরাঈল (আ.) বেহেশ্‌ত হতে এনেছিলেন। এটির বরকতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.) চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.) এর জামার মাধ্যমে হযরত ইয়াকুব (আ.) এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপঃ

হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের বললেন, “হে ভাইসকল! আমার সাথে তোমাদের অতীতে কৃত অসদাচরণের অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। সুতরাং অপরাধবোধে তোমরা কোন প্রকার চিন্তাক্লিষ্ট হয়ো না। আমি দো’আ করছি, মহান আল্লাহ্ যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন। আল্লাহ্ তা’আলাও তোমাদেরকে মাফ করুন। এখন আমাকে আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করাও। তবেই তোমাদের মুক্তি। আচ্ছা বল তো! আব্বার দৃষ্টিশক্তি কি করে চলে গেছে?” ভাইয়েরা বলল, তোমার জামা চোখে রেখে রাত দিন কাঁদতে কাঁদতে আব্বা অন্ধ হয়ে গেছেন। তখন ইউসুফ (আ.) বললেন, “ঠিক আছে, আমার এ জামাটা নিয়ে আব্বার চেহারায় ঝুলিয়ে দাও। এটাই তাঁর চিকিৎসা। এতেই অতি তাড়াতাড়ি তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।” উপর্যুক্ত কথাবার্তা বলে হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদেরকে নিয়ে খাবার খান। তাদেরকে ভাল ভাল মূল্যবান পোশাক উপহার দেন। ভাইদেরকে পোশাকাদি প্রদানের পর উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “তোমাদের মাঝে এমন কে আছে যে অতি তাড়াতাড়ি আমার সংবাদ আমার আব্বাকে পৌঁছাতে সক্ষম, যাতে আমার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।” ইউসুফ (আ.)-এর বলার পর উপস্থিত লোকজনের মধ্য হতে ইয়াহুদা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়ায়, যে প্রত্যহ দেড়’শ ক্রোশ (১ ক্রোশ = ২ মাইল বা ৪ মাইল) পথ অতিক্রম করতে পারত। ইউসুফ (আ.) তাঁকে বললেন, ‘আপনি গিয়ে আমার আব্বাকে আমার এখানে অবস্থানের শুভ সংবাদ অবগত করুন।’ হযরত ইউসুফ (আ.) এর বাহুতে তাবিজ রূপে যে খিরকাটি বাঁধা ছিল সেটি হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে নমরূদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করার পর হযরত জিবরাঈল (আ.)

জান্নাত হতে রেশমী খিরকা এনে পরিয়ে দিয়েছিলেন। এ খিরকার কল্যাণেই নমরূদের অগ্নিকুণ্ড তাঁর জন্য ফুল বাগিচা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি নমরূদের অগ্নিকুন্ড হতে মুক্তি পেয়েছিলেন। হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর সেই খিরকা হযরত ইয়াকুব (আ.) পিতার উত্তরাধিকার স্বত্বরূপে পেয়েছিলেন। তিনি যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ভাইদের সাথে যেতে দেন তখন এই জান্নাতী খিরকাটি তাবিজে ঢুকিয়ে তাঁর বাহুতে বেঁধে দেন। কুপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সেই তাবিজ হতে খিরকাটি বের করে হযরত জিবরাঈল (আ.) পুনরায় হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পরিয়ে দিয়েছিলেন। সে জামাটি তাঁর বাহুতে তাবিজ আকারে বাঁধা ছিল, তিনি সেটি খুলে ইয়াহুদার হাতে দিয়ে বললেন, এটি নিয়ে আব্বার চেহারার উপর রাখ, এতেই চোখ ভাল হয়ে যাবে, দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। তিনি চোখে দেখেই আমার কাছে চলে আসতে সক্ষম হবেন। মিসরের প্রবেশ পথে বের হয়েই জামাটি কেনান অভিমুখে প্রবাহিত বাতাসের দিকে ধরে রাখবে, তাহলে আব্বা খুব তাড়াতাড়ি এ জামার গন্ধ পেয়ে যাবেন। দূত ইয়াহুদা মিসর শহরের বাইরে গিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.) প্রদত্ত জামাটি কেনান অভিমুখে প্রবাহিত হওয়ার দিকে ফিরিয়ে ধরেন। বাতাস এ জামার গন্ধ হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর নিকট পৌঁছে দেয়। তখন হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁর সন্তানাদির যারা কাছে উপস্থিত ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, 'আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। একথায় তোমরা আমাকে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করো না।" কিছু সময় পরই প্রেরিত দূত হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সুসংবাদ শুনায়। ইউসুফের সুসংবাদ শুনতেই তিনি উঠে দূতকে অতি আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, বল তো ইউসুফ কোথায় আছে, কেমন আছে। দূত জবাব দিল, 'তিনি মিসরে আছেন। বর্তমানে তিনি মিসরের বাদশাহ্। বিনইয়ামীন এবং অন্যান্য ভাইয়েরা মিসরে খুব ভালভাবে আরামেই আছেন। ইয়াহুদাও আসছে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামা নিয়ে আপনার চেহারায় বুলিয়ে দিতে, যাতে আপনার চোখ ভাল হয়ে যায়। ইউসুফ (আ.) পরিবারের সকল সদস্যদের মিসরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছেন।' একথায় ইয়াকুব (আ.) বললেন, ভাল কথা। এতে ক্ষতির কি আছে। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বল তো ইউসুফ কোন দ্বীনের উপর আছে। বাপ দাদার দ্বীনের উপর রয়েছে নাকি তার দ্বীন পরিবর্তিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি শংকাবাধে করছি। দূত জবাব দিল, তিনি এখনও পিতৃপুরুষের দ্বীনের উপরই স্থিত রয়েছেন। একথা শুনে হযরত ইয়াকুব (আ.) সিজদাবনত হয়ে আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর খবর শুনে কেনানের সমগ্র লোকজন খুশি হয়। ইতিমধ্যে ইয়াহুদাও এসে পৌঁছেন। হযরত ইউসুফ (আ.) প্রেরিত জামা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে দিলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। তখন তিনি

বললেন, আমি বলেছিলাম না যে, হারানো ইউসুফের গন্ধ ভেসে আসছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন পাকে আল্লাহ্ বলেন,

> "অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হল এবং তাঁর মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখল তখন তিনি দৃষ্টি ফিরে পেলেন। তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, আমি আল্লাহ্‌র নিকট হতে যা জানি তা তোমরা জান না!" (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৯৩)

হযরত ঈসা (আ.) এর চাদর

কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদিন দামেশকের জামে মসজিদে অন্ধকারে মুসলমানরা নামাযের জন্য একত্রিত হবে। নামাযের একামত হবে এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ইমামতি করার জন্য জায়নামাযে দাঁড়াবেন। হঠাৎ এক আওয়াজ উপস্থিত সকলকে সচকিত করে তুলবে। তখন মুসলমানরা চোখ তুলে তাকাতেই আকাশ সাদা মেঘ সমাচ্ছন্ন দেখতে পাবে। অল্প কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে, হযরত ঈসা (আ.) সুন্দর হলুদ বর্ণের দু'খানা চাদর গায়ে জড়িয়ে দু'জন ফেরেশ্‌তার কাঁধে ভর করে ঊর্ধ্বজগত থেকে ধূলির ধরার প্রতি অবতরণ করছেন। ফেরেশ্‌তাদ্বয় তাঁকে মসজিদের মিনারার উপর নামিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। তিনি নামাযের কাতারে এসে দাঁড়াবেন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) তখন হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্মানার্থে পেছনে সরে ইমামতের অনুরাধে জানাবেন। তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে বলবেন, এই একামত আপনার ইমামতের জন্য বলা হয়েছে; সুতরাং এ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি আপনিই করুন। নামায শেষ করে হযরত ঈসা (আ.) অস্ত্রশস্ত্র সহ দাজ্জালকে হত্যা করতে বের হবেন।

হযরত রাসূলে করিম (দ.) এর খিরকা প্রদান সম্পর্কিত বর্ণনা

নবী করিম (দ.) এর চাদরের অভ্যন্তরে আহলে বাইতের অবস্থান – ৩৩

বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনানুসারে নবী করিম (দ.)-এর খিরকা, চাদর ও পাগড়ি মোবারক – ৩৫

ইমাম শরফউদ্দিন মুহাম্মদ আল বুসিরী (র.)'র স্বপ্নে বিশ্বনবীর (দ.) চাদর প্রাপ্তি – ৩৯

নবী করিম (দ.)-এর জীবদ্দশায় হযরত কা'আব ইবনে যুহাইর (রা.)-এর চাদর প্রাপ্তি – ৪১

প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতে নবী করিম (দ.) এর ব্যবহৃত চাদর – ৪১

আয়লা'র অধিবাসীকে নবী করিম (দ.)-এর চাদর প্রদান – ৪২

নবী করিম (দ.)-এর দরবেশী খিরকা – ৪৩

নবী করিম (দ.) কর্তৃক হযরত উমর (রা.)-কে খিরকা বানানোর জন্য নির্দেশ দিয়ে চাদর দান – ৪৪

নবী করিম (দ.)-এর দাওয়াত প্রদানে ব্যবহৃত চাদর – ৪৪

নবী করিম (দ.)-এর চাদরের অভ্যন্তরে আহলে বাইতের অবস্থান

(১) আহলে বাইত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে, "ওহে নবীর বংশধর! আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হলো যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক ধরনের অপবিত্রতা দূরীভূত করবেন এবং তোমাদের সর্বদিক দিয়ে পুতঃপবিত্র রাখবেন" (সূরা আহযাব, আয়াতাংশ-৩৩)। উপর্যুক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা আহলে বাইত সম্পর্কে যে ঘোষণা দিয়েছেন এটি নাযিল হয় উম্মুল মু'মিনিন হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর হুজরা শরিফে। এ প্রসঙ্গে হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন, উক্ত আয়াত নাযিল হবার পূর্বে হযরত রাসূলে করিম (দ.) নির্দেশ দেন, "কাউকেও এখানে আসার অনুমতি দেবে না।" এর অল্প কিছুক্ষণ পরে হযরত ফাতেমা (রা.) তশরীফ আনেন। হুজুর (দ.) এর নিষেধাজ্ঞা স্মরণ করে তিনি উল্লেখ করেন, কি করে আমি মেয়েকে তাঁর পিতার নিকট যেতে বাধা দিতে পারি? অতঃপর হযরত হাসান (রা.) আসেন। কে নাতিকে তাঁর নানার কাছে যেতে বাধা দেবে? তারপর হযরত হোসাইন (রা.) আসেন। তাঁকেও আমি বাধা দেই নি। এরপর হযরত আলী (রা.) আগমন করেন। তাঁকেও আমি বাধা দিতে পারিনি। তাঁরা সবাই যখন একত্রিত হলেন তখন হযরত রাসূলে করিম (দ.) তাঁদেরকে পরিহিত পবিত্র চাদর দ্বারা আবৃত করে বলেন, "হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বাইত। সুতরাং আপনি এদের অপবিত্রতা দূর করে দিন এবং এদেরকে পবিত্র করুন।" এ সময় উপর্যুক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যখন এদেরকে চাদর দ্বারা আবৃত করা হয়, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (দ.)! আমি কি এদের অন্তর্ভুক্ত? কিন্তু আল্লাহ্ জানেন, তিনি আমার এ প্রশ্নে সন্তোষ প্রকাশ করেন নি। তবে শুধু বলেন, "তুমি কল্যাণের দিকেই রয়েছ।"

হযরত উম্মে সালমা (রা.)'র প্রশ্নের পবিত্র প্রতিক্রিয়ায় আহলে বাইত এবং উম্মুল মু'মিনিন (রা.) বিষয়ে সুক্ষ্ম স্বতন্ত্র ধারা বিশ্বনবী (দ.) পৃথিবীবাসীর কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

(২) হযরত ইবনে হাওশিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি তার চাচাতো ভাই হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট গমন করে তাকে হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন, তুমি আমাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। তার বাড়ীতেই তার প্রিয়তমা কন্যা ছিলেন। যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর নিকট সবচেয়ে বেশি ভালবাসার পাত্রী। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-কে দেখেছি যে, তিনি হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হোসাইন (রা.)-কে আহ্বান করেন। অতঃপর তিনি তাদের উপর কাপড় নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, "হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বাইত। সুতরাং আপনি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করুন এবং তাদেরকে পবিত্র করে দিন!" আমি তখন তাদের নিকটবর্তী হলাম। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (দ.)! আমিও কি আপনার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত? তিনি জবাবে বললেনঃ "নিশ্চয়ই, জেনে রেখো যে, তুমি কল্যাণের উপর রয়েছে।" (তাফ্সীর ইবনে কাসীর)

আহলে বাইত প্রসঙ্গে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ পেশ করে উল্লেখ করেন, "হে আল্লাহ্! এই চাদরের মধ্যে যাঁরা আছেন, এরা আমার আহলে বাইত এবং আমার বিশেষ পরিজন! আপনি তাঁদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করুন এবং তাঁদেরকে পুতঃ পবিত্র রাখুন" (তাফ্সীরে খাযেন, তৃতীয় খণ্ড ৪৪ পৃষ্ঠা)। আহলে বাইতের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা প্রদর্শন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "ওহে আমার হাবীব! আপনি বলে দিন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের থেকে হেদায়ত ও রেসালতের বাণী প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের নিকট আমার অতি নিকটতম আপনজন এবং আত্মীয়দের প্রতি ভক্তি ও মুহব্বত ছাড়া আর কিছু তালাশ করছি না" (সূরা শুরা : আয়াতাংশ-২৩)। উপর্যুক্ত আয়াতের আলোকে দেখা যায় আহলে বাইতের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা প্রদর্শন ফরজ হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে। আর আহলে বাইতরা হলেন পুতঃপবিত্র এবং বিশ্বনবী (দ.)-এর পরিধেয় মোবারক চাদরের অভ্যন্তরে আবৃত। অর্থাৎ আহলে বাইতগণ মহানবী (দ.)-এর নিকট থেকে সরাসরি চাদরাকৃতির খিরকা প্রাপ্ত।

বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনানুসারে নবী করিম (দ.)-এর খিরকা, চাদর ও পাগড়ি মোবারক

১. হযরত ইবনে আবু কাসির (র.) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, একদিন আমি আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-কে কোরআনের সর্বপ্রথম নাজিল হওয়া আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "ইয়া আয়্যুহাল মুদ্দাস্‌সিরু"। আমি বললাম, লোকেরা তো বলে "ইক্‌রা বিসমি রাব্বিকা"। আবু সালামা বললেন, এ বিষয়ে আমি হযরত জাবের (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তুমি আমাকে যা বললে, আমিও তাকে অবিকল তাই বলেছিলাম। জবাবে হযরত জাবের (রা.) আমাকে বললেন, হযরত রাসূলে করিম (দ.) আমাদের কাছে যা বলেছেন, আমিও তোমাকে হুবহু তাই বলব। নবী করিম (দ.) বলেছেন, আমি হেরা গুহায় (দিবা-রাত্র) এক নাগাড়ে একমাস অতিবাহিত করেছি। সেখানের অবস্থানকাল শেষ করে আমি সমতল ভূমিতে অবতরণ করলাম। এ সময় আমাকে কেউ ডাক দিল। আমি ডানে তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না, আবার বামদিকে তাকালাম তখনো কিছু দেখলাম না, আবার পিছনে তাকালাম এবারও কিছুই দেখলাম না। এরপর আমি মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালাম।

এবার বিরাট কিছু [হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে] তাঁর আসল আকৃতিতে দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি বিবি খাদীজার কাছে এসে বললাম, "আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত কর", আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত করা হল এবং আমার গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালল, তখন নাজিল হলো "হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি। উঠুন! সকলকে সতর্ক-সাবধান করুন। আপনার রবের মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা হতে নিজেকে পৃথক রাখুন।" এটা নামায ফরজ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। (মিশ্‌কাত শরিফ-৫৮৩৯)

২. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, একদিন ভোরে নবী করিম (দ.) একটি কালো বর্ণের পশমি নক্‌শী কম্বল গায়ে দিয়ে বের হলেন। এমন সময় হাসান ইবনে আলী সেখানে আসলেন, তিনি তাঁকে কম্বলের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর হুসাইন আসলেন, তাঁকেও হাসানের সাথে

ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর ফাতেমা আসলেন, তাঁকেও তাতে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর আলী আসলেন, তাঁকেও তার ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর নবী করিম (দ.) কোরআনের এ আয়াত পড়লেন– "হে আমার আহলে বাইত! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে গুনাহের অপবিত্রতা হতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চান।" (মিশ্কাত শরিফ-৬১২৪)

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, একদা হযরত রাসূলে করিম (দ.) হযরত আব্বাস (রা.)-কে বললেন, সোমবার বিকালে আপনি আপনার সন্তানসহ আমার নিকট আসবেন। তখন আমি আপনাদের জন্য এমন কিছু বিশেষ দোয়া করব, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ও আপনার সন্তানকে উপকৃত করেন। [হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন] সুতরাং তিনি এবং তাঁর সাথে আমরা সকলে উপস্থিত হলাম, তখন হযরত রাসূলে করিম (দ.) তাঁর চাদর আমাদের গায়ে জড়িয়ে দিলেন, অতঃপর এভাবে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আব্বাস ও তার সন্তানদের মাফ করে দাও, তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক হতে পবিত্র রাখ। তাদের কোনো প্রকারের গুনাহই বাকি রেখো না। হে আল্লাহ্! আব্বাসকে তাঁর সন্তানদের মাঝে নিরাপদে রাখ।" (মিশ্কাত শরিফ-৬১৪৬)

৪. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, একদা কোন একদিন প্রয়োজনে রাতের বেলায় আমি নবী করিম (দ.)-এর খেদমতে গেলাম। তখন নবী করিম (দ.) এমন অবস্থায় ঘর হতে বের হলেন যে, (মনে হলো), তিনি চাদর দ্বারা গায়ের সাথে কি একটি জিনিস জড়িয়ে রেখেছেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি, সে জিনিসটি কি? অতঃপর যখন আমি প্রয়োজন সেরে তাঁর নিকট হতে অবসর হলাম, তখন জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (দ.)! চাদরের ভিতরে আপনি কি জিনিস জড়িয়ে রেখেছেন? তখন তিনি চাদরখানা সরিয়ে ফেললে দেখলাম, হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হুসাইন (রা.) দুজন তার দুই উরুতে বসে রয়েছেন। অতঃপর তিনি বললেন, এরা দুজন আমার পুত্র এবং তনয়ার পুত্র। 'হে আল্লাহ্! আমি এদের দুজনকেই ভালোবাসি। সুতরাং আপনিও তাদের দুজনকে ভালোবাসুন। আর যারা এ দুজনকে ভালোবাসবে, আপনি তাদেরকেও ভালোবাসুন।' (মিশ্কাত শরিফ-৬১৫৩)

৫. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলে করিম (দ.) একবার (অসুস্থ অবস্থায়) যায়েদের পুত্র উসামার গায়ের উপর ভর করে বের হলেন এবং জামাতে নামায পড়ালেন। তখন তাঁর পবিত্র দেহ একখানা ইয়েমেন দেশীয় নক্‌শাদার চাদরে আচ্ছাদিত ছিল। [শমায়েলে তিরমিজী, অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর পোশাকের বয়ান]

৬. হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলে করিম (দ.)-এর নিকট (সকল কাপড়ের মধ্যে) ইয়েমেন দেশীয় বুটিদার চাদর অধিক পছন্দনীয় ছিল (অর্থাৎ পরিধানের জন্য খিরকা এবং আচ্ছাদনের জন্য বুটিদার চাদর বেশ পছন্দ করতেন)। [শমায়েলে তিরমিজী, অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর পোশাকের বয়ান]

৭. হযরত আবু জোহাইফাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন, “আমি রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-কে এক জোড়া লাল কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। হুযুরে আকরাম (দ.) এই উভয় থোড়ের চমক আমি যেন এখনও দেখছি।” (এই হাদিসের রাবী) হযরত সুফ্‌ফান (রা.) বলেন, “আমি মনে করি উক্ত লাল জোড়া নক্‌শীদার ছিল।” [শমায়েলে তিরমিজী, অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর পোশাকের বয়ান]

৮. হযরত আবু রিমসাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন, “আমি রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-কে দুইটি সবুজ চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত দেখেছি।” [শমায়েলে তিরমিজী, অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর পোশাকের বয়ান]

৯. হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (দ.) একদিন সকালে বাড়ি হতে বের হলেন। তখন তাঁর পবিত্র দেহ কাল পশমের একটি চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। [শমায়েলে তিরমিজী, অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর পোশাকের বয়ান]

১০. হযরত মুগীরাহ ইবনে শু’বা (রা.) বলেছেন, হযরত রাসূলে করিম (দ.) সংকীর্ণ আস্তিনদ্বয় বিশিষ্ট এক রুমী জুব্বা পরিধান করেছিলেন। [শমায়েলে তিরমিজী, অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর পোশাকের বয়ান]

১১. হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলে করিম (দ.) মক্কা বিজয়ের দিন যখন শহরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর পবিত্র মস্তকে কাল পাগড়ি ছিল। [শমায়েলে তিরমিজী, অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর পাগড়ি সম্বন্ধে বর্ণনা]

১২. হযরত আবু বরদাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) আমাদেরকে একটি তালিযুক্ত চাদর আর একটি মোটা কাপড়ের লুঙ্গি দেখালেন এবং বললেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর ওফাত এই কাপড় দুইখানাতেই হয়েছে। [শমায়েলে তিরমিজী, অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর লুঙ্গি সম্বন্ধে বর্ণনা]

১৩. হযরত সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী (রা.) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা একখানা চাদরসহ হযরত রাসূলে করিম (দ.) এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (দ.)! আপনার জন্য আমি নিজ হাতে এটা বুনেছি। চাদরের প্রয়োজন অনুভব করে রাসূলল্লাহ্ (দ.) তা গ্রহণ করলেন, অতঃপর তা লুঙ্গির মতো করে পরিধান করে আমাদের নিকট আসলেন। তখন অমুকের পুত্র অমুক এসে বললো, হে রাসূল (দ.)! চাদরটা কী চমৎকার। এটা আমাকে পরতে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেনঃ আচ্ছা। তিনি বাড়িতে গিয়ে চাদরটা ভাঁজ করে তার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন তাকে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! কাজটা তুমি ভালো করোনি। নবী করিম (দ.) প্রয়োজন অনুভব করেই তা পরেছিলেন। আর তুমি তাঁর নিকট তা চেয়ে নিলে! অথচ তুমি জানো যে তিনি কোন প্রার্থীকেই বিমুখ করেন না। সে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এটা পরার জন্য তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেইনি, বরং আমার কাফন বানানোর জন্য চেয়ে নিয়েছি। সাহল (রা.) বলেন, লোকটা যেদিন মারা গেল সেদিন সেটিই তার কাফন হলো। (ইবনে মাজাহ্-৩৫৫৫)

১৪. হযরত মোল্লা জয়ূন (র.) সনদের সাথে বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা হযরত রাসূলে করিম (দ.) এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (দ.) আপনার গরীব উম্মতগণ ধনী উম্মতগণের অর্ধদিবস (এটি বর্তমান কালের পাঁচশত বৎসর) পূর্বে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবেন। এটি শুনে হযরত রাসূলে করিম (দ.) খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে গান করতে পারে এমন লোক আছে কি? জনৈক বদরী বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (দ.) আমি পারি। তখন হযরত রাসূলে করিম (দ.) লোকটিকে গান করতে বললে লোকটি আরবী এই গানটি করল–

'ক্বাদ ছা'আত হাইয়াতুল হাওয়া কাবাদী যাহার
ফালা তাবীবা লাহা তাবীবা লাহা ওয়ালা রাক্বী'

অর্থ: 'অনর্থ ও খাহেশাতে নফ্সানীর সর্প আমার কলিজার দরদে বিস্তার লাভ করেছে, যাহার কোন আরোগ্যকারী এবং বিষক্রিয়া ও ধ্বংসকারী নাই।'

'ইল্লাল হাবীবুল্লাজী শাগাতু বিহি!
ফা-ইন্দাহু রক্বিয়াতী ওয়া তর ইয়াকী'

অর্থ: 'কিন্তু যে বন্ধুর প্রতি আমি আসক্ত, তারই নিকট আমার তাবিজ এবং বিষ পাথর।'

এতদ শ্রবণে হযরত রাসূলে করিম (দ.) ভাবান্বিত হয়ে অজদ করতে লাগলেন এবং সাহাবীগণও অজদ করতে লাগলেন। এমন কি নবী করিম (দ.) এর স্কন্ধ মোবারক হতে চাদর মোবারক পড়ে গেল। যখন এই মহাআনন্দ পবিত্র অজদ শেষ হল, প্রত্যেক সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করলেন। আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) বললেন, "আপনার অজদ কত যে সুন্দর ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (দ.)।" তখন নবী করিম (দ.) বললেন, 'যে ব্যক্তি বন্ধুর জিকির শুনিয়া অজদ করে না সে মহৎ নয়।' তারপর হযরত রাসূলে করিম (দ.) স্বীয় মহা পবিত্র চাদরখানা চারশত টুকরা করে উপস্থিত সাহাবীগণের মধ্যে বন্টন করলেন। (তাফসিরে আহমদি, সূরা লুকমান, আয়াত : ৬)

ইমাম শরফউদ্দিন মুহাম্মদ আল বুসিরী (র.)'র স্বপ্নে বিশ্বনবীর (দ.) চাদর প্রাপ্তি

"কাসিদায়ে বুরদা" পৃথিবীর মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত কবিতা বা নাতে রাসূল (দ.) হিসেবে পরিচিত। এই কাসিদার রচয়িতা হযরত শেখ আবু আবদুল্লাহ্ শরফউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে সাইদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ বুসিরী (র.)। তিনি ৬০৮ হিজরীর ১লা শাওয়াল ৭ মার্চ ১২১২ খ্রিস্টাব্দে বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় (মিসরের একটি জনপদ) 'বুসির'-এ অতিবাহিত করায় তিনি 'ইমাম বুসিরী' নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর পীর ছিলেন শাযিলীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক হযরত আবুল হাসান আশ্ শাযিলী (র.)-এর সুযোগ্য খলিফা হযরত আবুল আব্বাস আল মুরসী (র.)। হযরত ইমাম বুসিরী (র.) একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ, সুপ্রসিদ্ধ কবি, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বহু ভাষাবিদ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেছিলেন। সেই যুগে তাঁর মতো স্বভাবসিদ্ধ কবি আর কেউই ছিল না। তিনি মিসরের রাজধানী কায়রোতে ১২৯০ সালে ওফাত বরণ করেন। তাঁর মাজার মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত। হযরত ইমাম বুসিরী (র.) একবার দুরারোগ্য পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তাঁর এক পার্শ্ব অবশ হয়ে যায় ও তাঁর চলাফেরা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বহু চিকিৎসার পরেও

আরোগ্যলাভে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনি প্রিয়নবী (দ.)-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং প্রিয়নবী (দ.) এর প্রশংসায় একটি কাসিদা (কবিতা) লিখেন। গভীর মনোযোগ ও ভক্তিভরে কাসিদা আবৃত্তি করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখেন, সমগ্র ঘর আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে এবং প্রিয়নবী (দ.) সেখানে শুভাগমন করেছেন। প্রিয়নবী (দ.)-কে দেখে ইমাম বুসিরী আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন এবং স্বপ্নাবস্থায় প্রিয়নবী (দ.)-কে কাসিদা আবৃত্তি করে শোনাতে থাকেন। আবৃত্তি করতে করতে যখন কাসিদার শেষের দিকের একটি পংক্তি পর্যন্ত পৌঁছেন যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, "কাম আবরাআত আসিবা অর্থাৎ কত চিররুগ্ন ব্যক্তিকে নিরাময় করেছে প্রিয়নবী (দ.) এর পবিত্র হাতের স্পর্শ" তখন প্রিয়নবী (দ.) তাঁর পবিত্র হাত মোবারক ইমাম বুসিরীর অসুস্থ অংশে বুলিয়ে দেন এবং তিনি খুশি হয়ে নিজে পরিহিত নক্‌শাদার ইয়ামেনী চাদর ইমাম বুসিরীকে পরিয়ে দেন। ঘুম ভাঙ্গার পর ইমাম বুসিরী নিজেকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত পেলেন এবং দেখেন যে প্রিয়নবী (দ.) এর প্রদত্ত নক্‌শাদার ইয়ামেনী চাদর তাঁর গায়ে জড়ানো অবস্থায় আছে। তিনি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন। অতঃপর ফযর নামায মসজিদে আদায় করলেন এবং মসজিদ হতে ফেরার পথে জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে তাঁর দেখা হয়ে যায়। বুযুর্গ ব্যক্তি ইমাম বুসিরীকে বলেন, "আমি আপনার কাসিদাটি শুনতে ইচ্ছুক"। উত্তরে ইমাম বুসিরী বলেন, "আমার বহু কাসিদা আছে। প্রত্যেকেই সেগুলো জানেন।" তখন ওই বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন: "আমি সেটা শুনতে চাই যেটা কেউই জানেন না এবং যেটা গত রাতে আপনি প্রিয়নবী (দ.)-কে পড়ে শুনিয়েছেন।" হযরত ইমাম বুসিরী বিস্মিত হয়ে বললেন, "আমি তো কাউকেই এটা বলিনি। আপনি কীভাবে জানলেন?" বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, গতরাতে যখন আপনি এ কাসিদা প্রিয়নবী (দ.)-এর খেদমতে পাঠ করছিলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত থেকে তা শুনছিলাম। কেবল আমি নই, তখন এ কাসিদা আল্লাহ্ পাক তার বিশেষ বিশেষ বান্দাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে হযরত ইমাম বুসিরী (র.) এই কাসিদাটির নামকরণে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন। এ কাসিদার মূল নাম "আল কাওয়াকিবুদ দুররিয়া ফি মাদহি খাইরিল বারিয়্যাহ" (শ্রেষ্ঠ মানবের প্রশংসায় উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা)। এ নামেই কাসিদাটি প্রথম দিকে খ্যাতি লাভ করে। মূল নাম ছাড়াও কাসিদাটির আরো দু'একটি নাম প্রচলিত আছে। এই কাসিদার সর্বাধিক পরিচিতি নাম "আল বুরদাহ"। বুরদাহ শব্দের অর্থ ডোরাকাটা বা নকশি চাদর। এই নামকরণের একটি তাৎপর্য এই যে-নক্‌শি চাদরের যেমন নানান রং ও বিচিত্র নক্‌শা থাকে, তেমনি প্রিয়নবী (দ.) এর প্রশংসায় এই কাসিদাতে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

নবী করিম (দ.)-এর জীবদ্দশায় হযরত কা'আব ইবনে যুহাইর (রা.)-এর চাদর প্রাপ্তি

হযরত কা'আব ইবনে যুহাইর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী করিম (দ.)-এর প্রশংসায় তাঁর সম্মুখে একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। নবী করিম (দ.) সন্তুষ্ট হয়ে তাকে একটি বুরদা বা চাদর উপহার দেন। সেই কারণে কবিতাটি কাসিদাতুল-বুরদা নামেও খ্যাতি লাভ করেছে। কবিতাটির প্রথম লাইনের প্রথম দুইটি শব্দ 'বানাত সু'আদ', তাই এটি 'বানাত সু'আদ' নামেও পরিচিত। এই কবিতার প্রতিটি শ্লোক (বয়েত)-এর শেষ শব্দের শেষ হরফ লাম হওয়ায় এটিকে 'কাসিদাতুল-লামিয়্যা'ও বলা হয়। হযরত আমিরে মুয়াবিয়ার শাসনকালে তিনি হযরত কা'আব ইবনে যুহাইর (রা.)-কে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের (দ.) চাদর ১০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমার নিকট বিক্রয় কর। কিন্তু হযরত কা'আব এই প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানান। হযরত কা'আবের ওফাতের পর হযরত আমিরে মুয়াবিয়া ২০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে হযরত কা'আবের পুত্রদের কাছ থেকে এই চাদর কিনে নেন। এই চাদর মোবারকটি উমাইয়া শাসকরা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে, বিশেষত ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে বরকতের জন্য পরিধান করতেন। তারপর আব্বাসীয় খলিফাদের অধিকারে এই চাদর হস্তগত হয় বলে কেউ কেউ বিভিন্ন ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আয্‌ যাহাবী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আমিরে মুয়াবিয়ার কেনা এই চাদর উমাইয়া শাসন পতনের সময় চুরি হয় বা হারিয়ে যায়।

প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতে নবী করিম (দ.) এর ব্যবহৃত চাদর

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল উরওয়া বিন আজ জোবায়ের-এর সনদ দিয়ে তাঁর 'জুহদ'-এ উল্লেখ করেছেন, যে চাদর পরে নবী করিম (দ.) প্রতিনিধিদলদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তা হাজরামাউতের থেকে নেওয়া হয়েছিল আর এটির দৈর্ঘ্য ছিল চার হাত, প্রস্থ দুহাতের একটু বেশি। এটি খলিফাদের অধিকারে ছিল। কালক্রমে এটি সূতী-সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ালে খলিফারা এর সঙ্গে বস্ত্র সংযোজন করে ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার অনুষ্ঠানে এটি ব্যবহার করতেন। বাস্তবিকই এই চাদর খলিফাদের অধিকারে ছিল এবং তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পর পর এর অধিকারী হতেন। কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বা কোন

সমাবেশে অথবা অশ্বারোহী বাহিনীর অভিযানে তারা কাঁধের উপর ঝুলিয়ে পরতেন। আল-মুক্তাদির নিহত হওয়ার সময় এটি তাঁর স্কন্ধে ছিল এবং এটি তাঁর রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। আমার মনে হয় তাতারদের আক্রমণের সময় এটি হারিয়ে গিয়েছিল।

আয়লা'র অধিবাসীকে নবী করিম (দ.) এর চাদর প্রদান

আল-হাফিজ আল-বায়হাকী, ইবন ইসহাক-এর বরাতে তাবুক গাযওয়া-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, নবী করিম (দ.) তাবুক হতে প্রত্যাবর্তনকালে আয়লা'র অধিবাসীদেরকে একটি নিরাপত্তা সনদ লিখে দেন এবং তাদেরকে শান্তির প্রতীক হিসেবে একটি চাদরও প্রদান করেন। এই চাদরখানা প্রথম আব্বাসীয় বাদশাহ্ আবুল-আব্বাস আব্দুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ আস-সাফফাহ্ তাদের নিকট হতে ৩ (তিন) শত দীনার মূল্যে ক্রয় করে নেন। এই পবিত্র চাদরখানাই আব্বাসী খলিফাদের অধিকারে থাকে (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)। আর এক বর্ণনামতে বাগদাদের পতনকালে এই চাদরটি হালাকু বাহিনীর হাতে বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে এই দাবীও করা হয়েছে যে, চাদরটি ধ্বংসযজ্ঞ হতে রক্ষা পায়। অতঃপর মিসরের মামলুক সুলতান বায়বারস কায়রোতে আব্বাসীয় খিলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলে এই মুবারক চাদরখানাও কায়রোতে স্থানান্তরিত হয়। নামেমাত্র এই খলিফাগণ পূর্ববৎ বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এটি পরিধান করতেন। উসমানীয় সুলতান প্রথম সেলিম (সালিম) ৯২৩/১৫১৭ সালে মিসর জয় করে শেষ আব্বাসীয় শাসক আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহকে পদচ্যুত করেন এবং নিজেই খলিফাতুল-মুসলিমীন উপাধি ধারণ করেন। খিলাফাতের পবিত্র নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত এই পবিত্র চাদরটি তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান। উসমানীয় খলিফাগণও বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এটি পরিধান করতেন। নব্য তুরস্কের সংসদ খিলাফত বাতিল ঘোষণা করলে (৩ মার্চ, ১৯২৪) সুলতান ২য় আবদুল-মাজীদ পদচ্যুত হন। কামাল আতাতুর্ক ১৯৩৪ সালে ইস্তাম্বুলের বৃহত্তম মসজিদ আয়া সোফিয়াকে যাদুঘরে পরিণত করলে সেখানে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শনসমুহের সঙ্গে এই পবিত্র চাদরটিও সংরক্ষণ করা হয়। দর্শনার্থীদের বিশেষ বিশেষ সময়ে এটি দেখতে দেওয়া হয়। (ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

নবী করিম (দ.) এর দরবেশী খিরকা

হযরত রাসূলে করিম (দ.) মিরাজ হতে ফিরে আসার পর সাহাবাদেরকে ডেকে ইরশাদ করলেন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে আমার দরবেশী খিরকা ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করবো যে আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে। আমি জানিনা, সঠিক উত্তর আমি কার নিকট হতে পাব। প্রথমে আমিরুল মু'মিনীন হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.)-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, যদি আমি তোমাকেই এ দরবেশী খিরকা দান করি তাহলে তুমি এর হক কিভাবে আদায় করবে? হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) জওয়াব দিলেন, বিশ্বস্ততা অবলম্বন করবো, মওলার বন্দেগীতে কছুর (ত্রুটি) করবো না এবং যে সব মাল আমার নিকট আছে এবং ভবিষ্যতে যা আসবে তার সমস্ত কিছুই আল্লাহ্র রাস্তায় বিলিয়ে দিব। এরপর হযরত ওমর (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে ওমর! এ খিরকা যদি তোমাকে দেয়া হয় তাহলে তুমি এর হক কিভাবে আদায় করবে? আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) বললেন, আপনি যদি আমাকে এ দরবেশী খিরকা দান করেন তাহলে বিশ্বস্ততা অবলম্বন করবো; আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবো এবং অত্যাচারীদের প্রতিশোধ নিব। তারপর হযরত ওসমান গণি (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, যদি তোমাকে এ দরবেশী খিরকা প্রদান করা হয় তাহলে তুমি এর হক কিভাবে আদায় করবে? উত্তরে তিনি বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (দ.) এ খিরকা যদি আপনি আমাকে দান করেন তাহলে আমি উদারতা, বদান্যতা ও বিনয়াবনতা অবলম্বন করবো অর্থাৎ এ খিরকার যে হক আছে তা পরিপূর্ণরূপে আদায় করবো। সর্বশেষে আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, যদি এ দরবেশী খিরকা তোমাকে দেয়া হয় তাহলে তুমি এর হক কিভাবে আদায় করবে? উত্তরে হযরত আলী (রা.) বললেন, ইয়া সরদারে দু'আলম (দ.), যদি আমাকে এ খিরকা দান করেন তাহলে আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত বান্দাদের ও এ খিরকার গোপনীয়তা রক্ষা করবো। হযরত রাসূলে করিম (দ.) বললেন, "এ জবাবই প্রকৃত জবাব যা আলী প্রদান করেছে। অতএব এ দরবেশী খিরকা তাকেই দেয়া হলো।"

নবী করিম (দ.) কর্তৃক হযরত উমর (রা.)-কে খিরকা বানানোর জন্য নির্দেশ দিয়ে চাদর দান

‘কাসাসুল আম্বিয়া’ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আদম তনয় কাবিল আর হাবিল পিতৃ নির্দেশে আল্লাহ্ তা'য়ালার উদ্দেশ্যে দুম্বা কোরবানী করেছিলেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালা আনুগত্য ও সততার প্রতীক হাবিলের কোরবানী করা দুম্বাটি গ্রহণ করেন। কোরবানীর পর আল্লাহ্ তা'য়ালা দীর্ঘ দুই হাজার বছর পর্যন্ত আলোচ্য দুম্বাটি জান্নাতে পেলে পুষে বড় করে অবশেষে হযরত ইসমাইল (আ.) এর স্থলে কোরবানীর জন্য প্রদান করেন। অতএব, হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত জান্নাতী দুম্বাটিই হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বিনিময়ে কোরবানী করেন। উক্ত দুম্বার চামড়া দিয়ে দস্তরখান বানিয়ে পরবর্তী কালে হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাতে বসিয়ে আল্লাহ্র বান্দাদের খানা খাওয়াতেন, তাদের মেহমানদারী করতেন। সেটির পশম দিয়ে হযরত সারাহ (আ.) একখানা চাদর বুনেন। সে চাদর হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাবুতে সাকীনায় রেখে দিয়েছিলেন। একদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাবুতে সাকীনা নিয়ে হযরত রাসূলে করিম (দ.)-এর কাছে আসেন। তিনি তাবুতে সাকীনায় রক্ষিত দুম্বার পশমের চাদরখানা হযরত উমর (রা.)-কে খিরকা বানানোর জন্য দান করেন। খিরকাটি জীবনভর হযরত উমর (রা.) এর নিকট ছিল বলে কথিত আছে।

নবী করিম (দ.) এর দাওয়াত প্রদানে ব্যবহৃত চাদর

“ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ” গ্রন্থে হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (ক.) আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত সম্বন্ধে বর্ণনায় বলেছেন, একবার হযরত রাসূলে করিম (দ.) আসহাবে কাহাফ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট আবেদন জানালেন। নির্দেশ এলো, আপনি দুনিয়ায় অবস্থান কালে তাদেরকে সরাসরি অবলোকন করতে পারবেন না, আখিরাতে দেখতে পারবেন। অবশ্য এটা হতে পারে যে, তারা আপনার উম্মতের মধ্যে সামিল হয়ে যেতে পারে এখনই। এ নির্দেশ পাওয়ার পর তিনি একটি চাদর এনে চাদরের চার কোণা চারজন সাহাবা হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর ফারুক (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত আবুজর গিফারী (রা.)-কে ধরতে বললেন। তাঁরা চাদরের চার কোণা ধরলে হযরত রাসূলে করিম (দ.) হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সিংহাসন যারা বহন করতেন তাদেরকে

উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি চাদরধারীগণসহ চাদরটিকে আসহাবে কাহাফের গুহার নিকটে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন। নির্দেশ পেয়ে তারা চারজন সাহাবাকে আসহাবে কাহাফের গুহার মুখে নামিয়ে দিলেন। তাঁরা গুহামুখে উপস্থিত হয়ে গুহাবাসীদের উদ্দেশ্যে সালাম নিবেদন করলেন। গুহার ভিতর হতে ওয়া আলাইকুম আস্ সালাম উত্তর এলো। তখন তাদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' (দ.) পাঠ করতে আহ্বান জানানো হলে তারা সন্তুষ্ট চিত্তে পাঠ করে নেন। সাহাবাগণ তাদের কর্ম শেষ করলে চাদর বহনকারীগণ তাদের পূর্বের স্থানে পৌঁছে দিলেন।

তাবেঈন এবং আওলিয়াল্লাহ্দের খিরকা সম্পর্কিত বর্ণনা

হযরত উয়ায়েস আল্-কার্নী (রা.)'র খিরকা প্রাপ্তি – ৪৭
গাউসুল আযম শাইখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)'র খিরকা প্রাপ্তি – ৪৯
হযরত মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী (র.)-এর খিরকা প্রাপ্তি – ৫০
হযরত আবদুর রহমান তাফ্সুঞ্জী (র.)'র পুত্রের খিরকা প্রাপ্তি – ৫১
হযরত সৈয়দ আবু সাআ'দা ক্বাইলুবী (র.)'র খিরকা, পাগড়ি ও চাদর প্রাপ্তি – ৫২
হযরত খাজা ওসমান হারুনী (ক.)-এর কুল্লাহ্ চাহার তর্কী (বিশেষ টুপি) প্রাপ্তি – ৫৩
হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (ক.)-এর খিরকা ও কুল্লাহ্ চাহার তর্কী (বিশেষ টুপি) প্রাপ্তি – ৫৫
হযরত খাজা ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকর্ (ক.) এর চাদর ও জায়নামায প্রাপ্তি – ৫৭
হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (ক.)-এর খিরকা প্রাপ্তি – ৫৮
হযরত আমির উলা সাঞ্জরী (র.)-এর কুল্লাহ্ চাহার তর্কী (বিশেষ টুপি) প্রাপ্তি – ৬০
হযরত খাজা হামিদুদ্দিন সুফি আস্ওয়ালী আন্নাগুরী (র.)-এর খিরকা প্রাপ্তি – ৬১
হযরত ওসমান সিয়াহ (র.)'র খিরকা প্রাপ্তি এবং হযরত আমির খসরু (র.)'র কুল্লাহ্ চাহার তর্কী (বিশেষ টুপি) প্রাপ্তি – ৬২
হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)'র স্বপ্নে নবী করিম (দ.) এর চাদর প্রাপ্তি – ৬৩

হযরত উয়ায়েস আল্-কার্নী (রা.)'র খিরকা প্রাপ্তি

হযরত উয়ায়েস আল-কার্নী একজন তাবেঈ ছিলেন। হযরত রাসূলে করিম (দ.) বলেছেন, "উয়ায়েস আল-কার্নী তাবেঈনগণের মধ্যে উত্তম।" হযরত উয়ায়েস আল্-কার্নী (র.) ইয়েমেন প্রদেশের 'কর্ন' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাই লোকে তাঁকে "আল-কার্নী" বলে ডাকতেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল উয়ায়েস। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হন। হযরত রাসূলে করিম (দ.)-এর ওফাতের সময় হযরত ওমর ফারুক (রা.) ও হযরত মওলা আলী (রা.)-কে বলেছিলেন, "তোমরা আমার ওফাতের পর আমার খিরকা উয়ায়েস আল-কার্নীকে দিয়ে দিবে এবং তাকে আমার সালাম জানাবে।" হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (ক.) তাঁর 'তায্কেরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থে হযরত উয়ায়েস আল-কার্নী (রা.)'র খিরকা প্রাপ্তির ঘটনা নিম্নরূপে উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌র (দ.) ওফাতের অনেক পরে হযরত ওমরের (রা.) খেলাফতের সময় হযরত ওমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) কুফায় গিয়ে খুৎবার মধ্যে সকলকে সম্বোধন করে বললেন, "হে কুফাবাসিগণ! তোমরা কি উয়ায়েসের সন্ধান দিতে পার?" সকলে উত্তরে বললেন, "সে একজন পাগল লোক, সংসর্গে বাস করে না। জঙ্গলে উট চরিয়ে থাকে। দিনশেষে একবার শুকনা রুটি আহার করে। লোকে যখন হাসে, সে তখন কাঁদে; লোকে কাঁদলে সে হাসে।" এর পর হযরত ওমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) একটি নির্জন স্থানের দিকে রওয়ানা হন। তাঁরা সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রথমে নামাযে রত দেখলেন। তিনি লোক আগমনের শব্দে নামায সংক্ষেপ করলেন এবং সাহাবাগণকে সালাম করলেন। হযরত ওমর (রা.) সালামের জওয়াব দিয়ে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি আবদুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র দাস) বললেন। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, "আমরা সকলেই আল্লাহ্‌র দাস। আপনার প্রকৃত নাম কি?" উত্তরে তিনি বলেন, "উয়ায়েস"। হযরত ওমর বললেন, "আপনার ডান হাতখানা দেখান।" উয়ায়েস তাঁর ডান হাতের তালু দেখালেন। হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এর নসীহত অনুসারে তাঁর ডান হাতের তালুতে সাদা চিহ্ন দেখতে পেয়ে হযরত ওমর (রা.) তাঁর হাতে চুম্বন করলেন এবং বললেন, "রাসূলুল্লাহ্ (দ.) আপনাকে সালাম

জানিয়েছেন ও নিজ খিরকা মোবারক আপনাকেই দান করেছেন এবং তাঁর উম্মতের জন্য দোআ করতে বলে গেছেন।” হযরত উয়ায়েস (র.) বললেন, “দোয়ার জন্য তো আপনারাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উপযুক্ত।” হযরত ওমর (রা.) বললেন, “আমরা তা করছি। কিন্তু আপনি রাসূলুল্লাহ্‌র (দ.) হুকুম পালন করুন।” হযরত উয়ায়েস (র.) বললেন, “হযরত ওমর! আপনি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখুন, রাসূলুল্লাহ্ (দ.) যার কথা বলেছেন হয়ত তিনি অন্য কেউ হবেন।” হযরত ওমর (রা.) বললেন, “আপনার হাতে যে চিহ্ন আছে বলে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলে গেছেন, আমি সেই চিহ্ন দেখছি”। হযরত উয়ায়েস (র.) বললেন, “আগে রাসূলুল্লাহ্‌র (দ.) খিরকাটি দিন, তারপর দো’আ করব।” হযরত ওমর (রা.) খিরকাটি প্রদান করলে হযরত উয়ায়েস (র.) সেটি গ্রহণ করলেন।

গাউসুল আযম শাইখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)'র খিরকা প্রাপ্তি

গাউসুল আযম শাইখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)'র পীর ছিলেন দুইজন: (১) হযরত আবুল খায়র হাম্মাদ বিন মুসলিম বিন ওরদাদ আল দাব্বাস (র.) ও (২) শায়খ হযরত আবু সাঈদ মোবারক ইবনে আলী ইবনে হুসাইন মাখযুমী (র.)। সাফীনাতুল আউলিয়া কিতাবে হযরত আবু সাঈদ মাখযুমী (র.)-এর কুনয়াৎ আবু সাঈদের স্থলে আবু ইউসুফ লিখা রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত কিতাবে আবু সাঈদই লিখিত রয়েছে। তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং শায়খ হযরত আবুল হাসান ইবনে আলহানকারী (র.)-এর মুরীদ ছিলেন। শায়খ হযরত আবু সাঈদ মোবারক ইবনে আলী ইবনে হুসাইন মাখযুমী (ক.) গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)'র খিরকা প্রদানকারী পীর ছিলেন। হযরত গাউসুল আযম জিলানী (ক.) বলেন, "একদিন আমার তীব্র ক্ষুধা পেয়েছিল। এমন সময়ে হযরত আবু সাঈদ মাখযুমী আমার নিকট তশরীফ আনয়ন করে আমাকে বললেন, 'আমার বাড়ীতে চলুন।' একথা বলেই তিনি চলে গেলেন। কিন্তু আমি তার বাড়িতে যেতে একটু ইতস্ততঃ করলাম। ইতিমধ্যে হযরত খিযির (আ.) এসে আমাকে সেখানে যেতে বললেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, হযরত শায়খ দরজায় দাঁড়িয়ে আমার প্রতীক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'আবদুল কাদের! আমার বলাই কি যথেষ্ট ছিল না? আবার হযরত খিযির (আ.)-কেও বলার প্রয়োজন পড়ল!' একথা বলেই তিনি ঘরের ভিতরে গিয়ে খাবার সাজিয়ে নিয়ে আসলেন এবং নিজের হাতে আমার মুখে গ্রাস তুলে দিয়ে আমাকে খাওয়াতে আরম্ভ করলেন। আমি তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাকে খাওয়াতেই থাকলেন। হযরত গাউসুল আযম জিলানী (ক.) আরও বলেন, "হযরত শায়খের হাতের যেই লোকমাটি আমার মুখে যেত, সাথে সাথে সেটি আমার অভ্যন্তরে এক অপূর্ব নূর পরিপূর্ণ করে দিত।" অতঃপর শায়খ হযরত আবু সাঈদ মোবারক ইবনে আলী ইবনে হুসাইন মাখযুমী (ক.) নিজ হাতে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)-কে বেলায়েতের খিরকা প্রদান করলেন এবং বললেন, "এটি সেই খিরকা যেটি হযরত রাসূলে করিম (দ.) হযরত আলী (রা.)-কে দান করেছিলেন। তাঁর নিকট হতে হযরত খাজা হাসান বসরী (রা.) পেয়েছিলেন। অতঃপর হাত বহাত হয়ে আমার হাত পর্যন্ত পৌঁছেছে। এটি এখন আমি আপনাকে প্রদান করেছি।" এই খিরকাটি পরিধান করা মাত্র হযরত গাউসুল আযম জিলানীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার নানাবিধ বরকত এবং তাজাল্লী আরও অধিক পরিমাণে প্রকাশ পেতে লাগল।

হযরত মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী (র.)-এর খিরকা প্রাপ্তি

হযরত মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী (র.) তাঁর 'ফতুহাতুল মক্কিয়া' গ্রন্থে তাঁর সুফি খিরকা প্রাপ্তির ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ইবনু আরাবীর পীর ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জামী (র.)। ইবনে জামী মসূলের অদূরে তাঁর বাগান বাড়িতে থাকতেন। একদিন সেখানে হযরত খিযির (আ.) এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তখন হযরত খিযির (আ.) তাঁকে একটি খিরকা পরিয়ে দেন। একই দিনে ইবনে জামী ঐ বাগান বাড়িতে ইবনু আরাবীকে সেই খিরকা পরিয়ে দেন। খিরকা গ্রহণ সম্পর্কে ইবনু আরাবী বলেন, "এরপর হতে খিরকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হই। ফলে নির্দিষ্ট লোকজনকে আমিও খিরকা পরাতে থাকি। কারণ আমি বুঝতে সক্ষম হই হযরত খিযির (আ.) খিরকাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতেন। এখন খিরকার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমার যে উপলব্ধি এর পূর্বে তা আমার ছিল না। যখন একজন মুরশিদ তাঁর কোনো মুরিদের মাঝে আধ্যাত্মিক অপূর্ণতার কোনো লক্ষণ দেখেন এবং তিনি তার সে অপূর্ণতাকে দূর করতে চান তখন তার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করেন। তখন আধ্যাত্মিকতার যে হালতে তিনি যে পোশাক পরিধান করে থাকেন তখন সে পোশাক উদ্দিষ্ট মুরিদকে পরিয়ে দেন। এরপর তাকে তিনি আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। এভাবে তিনি মুরিদের অন্তরে রূহানি ফয়েজ ঢেলে দেন।" ইবনু আরাবী (র.) দ্বিতীয় খিরকা লাভ করেন হযরত তকী আল দীন আবদ-আল রহমান ইবনে আলী আল তাওজারি আল কাস্তালানি (র.) হতে। এরপর খিরকা লাভ করেন হযরত মুহাম্মদ ইবনে কাসিম আল তামিমি আল ফাসি (র.) হতে। এছাড়া তিনি গাউসুল আযম শাইখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি (ক.) হতেও খিরকা লাভ করেছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান তাফ্‌সুঞ্জী (র.)’র পুত্রের খিরকা প্রাপ্তি

হযরত আবদুর রহমান তাফ্‌সুঞ্জী (র.) ছিলেন হযরত গাউসুল আযম জিলানী (ক.)’র সমসাময়িক অলিআল্লাহ্‌। হযরত গাউসুল আযম জিলানী তাঁর খুব প্রশংসা করতেন এবং সকলকে হযরত আবদুর রহমান তাফ্‌সুঞ্জীকে সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিতেন। হযরত আবদুর রহমান তাফসুঞ্জী সম্বন্ধে হযরত গাউসুল আযম জিলানী বলতেন, “শায়খ আবদুর রহমান তাফ্‌সুঞ্জী এমন এক মযবুত পাহাড়, যা কখনও টলে না।” ইরানের অন্তর্গত শহর তাফ্‌সুঞ্জে তিনি বাস করতেন এবং সেখানেই তাঁর পবিত্র রওজা অবস্থিত। তাঁর ওফাতের সময় নিজ পুত্রকে অসিয়ত করে বলেন, ‘শায়খ আবদুল কাদের জিলানীকে সম্মান করিও, তাঁর আদেশ মান্য করিও, তাঁর খেদমতে লেগে থাকিও।’ হযরত আবদুর রহমান তাফ্‌সুঞ্জীর ওফাতের পর স্বীয় পুত্র হযরত গাউসুল আযম জিলানী (ক.)’র খেদমতে আস্‌লে হযরত গাউসুল আযম জিলানী (ক.) তাঁকে সম্মান করলেন এবং নিজের খিরকা পরিয়ে দিলেন। অতঃপর নিজ কন্যার সাথে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন।

হযরত সৈয়দ আবু সাআ'দা ক্বাইলুবী (র.)'র খিরকা, পাগড়ি ও চাদর প্রাপ্তি

হযরত সৈয়দ আবু সাঈদ ক্বাইলুবী (র.) ছিলেন হযরত গাউসুল আযম জিলানী (ক.)'র সমসাময়িক অলিআল্লাহ্। তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। ইরাকের রাজধানী বাগদাদের নিকটবর্তী গ্রাম নাহ্রুল মুল্কের ক্বাইলুয়াতে অবস্থান করতেন এবং এখানেই তাঁর মাযার শরিফ অবস্থিত। হযরত সৈয়দ আবু সাঈদ ক্বাইলুবী (র.)'র পুত্র হযরত আবু সাআ'দা ক্বাইলুবী (র.) বলেন, আমার আব্বাজানের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আমি তাঁকে বললাম, "আমাকে কিছু অসিয়ত করুন।" তিনি বললেন, "প্রিয় বৎস! তোমাকে এই অসিয়ত করছি যে, শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর তা'যীম করিও।" তখন শায়খ মোহাম্মদ ইবনে মদীনী বললেন, "ইয়া সাইয়্যেদী! আমাকে শায়খ আবদুল কাদেরের সম্মানিত অবস্থা কিছু বলুন।" তিনি বললেন, "শায়খ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের এই যুগের আউলিয়ার রহস্যাবলীর কুল। এই যুগে তিনিই আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী বন্ধু।" হযরত আবু সাআ'দা ক্বাইলুবী (র.) বলেন, "আমার পিতার ওফাতের পর আমি শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি আমাকে সম্মান করলেন। আমাকে খিরকা, পাগড়ী ও চাদর পরালেন, যে পোশাক তিনি (হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী) পরিধান করতেন।

হযরত খাজা ওসমান হারুনী (ক.)-এর কুল্লাহ্ চাহার তর্কী (বিশেষ টুপি) প্রাপ্তি

"আনিসুল আরওয়াহ" গ্রন্থে হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তী (ক.) উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ওসমান হারুনী (ক.) যখন মুরিদ হওয়ার জন্য হযরত খাজা হাজী শরিফ জিন্দানী (ক.)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাঁর বাঞ্ছিত পীর মুর্শিদ হযরত খাজা শরীফ জিন্দানী (ক.)-এর কদম (পা) মোবারকে পড়ে বলতে লাগলেন, ওসমানের খায়েশ (বাসনা) আপনার ত্বরিকা (আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথ) গ্রহণ করা। হযরত খাজা শরীফ জিন্দানী (ক.) তাঁকে অত্যাগ্রহে স্বীয় ত্বরিকায় মুরিদ করেন। কুল্লাহ্ চাহার তর্কী (চার টুকরা কাপড়ে তৈরি গোল টুপি, যা চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার পীরগণ কাউকে উপযুক্ত মনে করলে মুরিদ করার সময় প্রদান করতেন) স্বীয় হস্তে হযরত খাজা ওসমান হারুনী (ক.)-কে মাথায় পরিয়ে দেন এবং ইরশাদ করলেন, হে ওসমান, যখন তুমি এ টুপি পরিধান করলে তখন তোমার উচিত এর হক (প্রাপ্য) প্রদান করা বা সম্পাদন করা এবং এর হক আদায় করতে তোমার প্রথম কাজ হবে দুনিয়াদারী ত্যাগ করা ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হতে নিজেকে মুক্ত করা। দ্বিতীয় কাজ হবে, লোভ-লালসা ও অহংকার বর্জন করা। তৃতীয় কাজ হলো, নফ্‌সের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলা। চতুর্থ কাজ হলো, রাতে ইলাহির জিকিরে মশগুল থাকা এবং শয়ন না করা। আমাদের শ্রেষ্ঠ মাশায়েখ (পীরগণ) বলছেন, যে কুল্লাহ্ চাহার তর্কী পরিধান করে সে স্বীয় অন্তর ও মনকে আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করে। হযরত রাসূলে করিম (দ.)-কে প্রথম এই কুল্লাহ্ চাহার তর্কী হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার দিক থেকে প্রদান করেন এবং বলেন, আপনি এটা পরিধান করুন এবং যাকে খুশি দান করে খলিফা নিযুক্ত করুন। হযরত রাসূলে করিম (দ.) এ টুপি পরিধান করার পর দারিদ্র্য ও উপবাসকে (রোজা) সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ টুপি যখন হযরত আলী (রা.) পরিধান করেছিলেন তিনি তখন হযরত রাসূলে করিম (দ.)-এর মতো দারিদ্র্য ও রোজাব্রত পালন করতেন। এভাবেই ত্বরিকার বংশ পরম্পরায় এ টুপি তার হক অর্থাৎ দাবি নিয়ে আমার নিকট পৌঁছেছে এবং আমি তোমার নিকট পৌঁছালাম; তুমিও পূর্বসুরিদের পথ অনুসরণ করবে। এরপর খাজা শরীফ জিন্দানী (ক.) বললেন, 'হে ওসমান, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌র ইবাদতে রাতদিন মশগুল থাকবে, দারিদ্র ও উপবাস (রোজা) জীবনযাপন করবে এবং বস্তুজগৎ ও তাতে নিমজ্জিত ব্যক্তিগণ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।' হযরত খাজা ওসমান (ক.) বললেন, আমি আপনার সমস্ত উপদেশ কবুল (গ্রহণ) করলাম। এরপর স্বীয় পীরের খানকাহ্ শরীফে তিন বছর উপস্থিত থেকে ইবাদত ও মুজাহিদায় (উপাসনা ও

সাধনায়) নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। হযরত খাজা শরীফ জিন্দানী (র.) যখন তার এ কঠোর রিয়াজত (সাধনা) অবলোকন করলেন তখন তাঁকে সাজ্জাদানশীন (ত্বরিকার শাসন ক্ষমতা দান করে) খলিফা নিযুক্ত করলেন এবং চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার পীরগণ কর্তৃক বংশ পরম্পরায় (সিলসিলাহ-ব-সিলসিলাহ) প্রাপ্ত ইস্‌মে আযম (আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ নাম, যা আল্লাহ্‌র আওলিয়া ছাড়া জানেন না) হযরত খাজা ওসমান হারুনী (ক.)-কে দান করলেন।

হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (ক.)-এর খিরকা ও কুল্লাহ্ চাহার তর্কী (বিশেষ টুপি) প্রাপ্তি

"দলিলুল আরেফিন" গ্রন্থে হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (ক.) উল্লেখ করেছেন যে, হযরত রাসূলে করিম (দ.) এর হিজরতের ৬১৩ বছর পর ৫ই রজব, বৃহস্পতিবার হযরত খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (ক.) নিজের বায়াত গ্রহন সম্বন্ধে বলেছেন, উপরোল্লিখিত তারিখে আমি বাগদাদ শহরের আবুল লায়ছা সমরকন্দি (র.)-এর মসজিদে উপস্থিত হয়ে গৌরবোজ্জ্বল হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তী (ক.)'র হাতে বায়াত গ্রহণ করে ধন্য হয়েছি। তিনি তাঁর দয়ার্দ্রপ্রেম ও করুণা দ্বারা আমায় স্বীয় ত্বরিকাভুক্ত করে "কুল্লাহ্ চাহার তর্কী" দান করলেন। (কুল্লাহ্ চাহার তর্কী অর্থ চার টুকরা কাপড়ে নির্মিত এক ধরনের টুপি যেটা চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার মাশায়েখ (পীরগণ) কোন ব্যক্তিকে মুরিদ হওয়ার উপযুক্ত মনে করলে তাকে মুরিদ করার পর এটি দান করেন। এই ধরনের টুপি প্রথম হযরত জিব্রাঈল (আ.) বেহেশ্‌ত হতে এনে হযরত রাসূলে করিম (দ.)-কে দিয়ে বলেন, "আপনি এটা পরিধান করুন এবং আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে খলিফা নিযুক্ত করুন।" হযরত রাসূলে করিম (দ.) নিজে এটি পরিধান করেন এবং চারটি খণ্ডের তিনটি, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওসমান গণি (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-কে দান করেন। এই চার খন্ডে তৈরি টুপির চার অংশের ব্যাখ্যায় হযরত খাজা আবদুল্লাহ্ সহল তশ্‌তরী (ক.) বলেছেন, প্রথম অংশ দ্বারা নূর ও রহস্যের স্তর, দ্বিতীয় অংশ দ্বারা মহব্বতের স্তর, তৃতীয় অংশ দ্বারা ইশ্‌ক এর স্তর, চতুর্থ অংশ দ্বারা সন্তুষ্টি ও সমর্পণের স্তর নির্দেশ করে।

অপর বর্ণনায় এসেছে, হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তী (ক.)'র কাতেব (করণিক) উপস্থিত ছিলেন। তাকে নির্দেশ দিলেন, "কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকীর নামে চিঠি লেখ, সে যেন দিল্লি যায়, খিলাফত এবং সাজ্জাদায়ে খাজেগান (খাজেগানের গদি) আমি তাকেই দান করছি। সে দিল্লিতেই অবস্থান করবে!" চিঠি লেখা শেষ হলে আমাকে দান করলেন। আমি আমার পীর ও মুর্শিদ খাজা গরীব নওয়াজের শুকরিয়া করলাম। হুকুম হলো, সামনে এসো। আমি কাছে গেলাম, হুজুর খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তী (ক.) স্বীয় হস্ত মোবারক দ্বারা তাঁর পাগড়ি মোবারক আমার মস্তকে রাখলেন এবং আমার দাদা পীর হযরত খাজা ওসমান হারুনী (ক.)-এর আশা (লাঠি), কুরআন শরিফ ও মুসল্লা (জায়নামায) যা তিনিও পেয়েছিলেন তাঁর মুর্শিদ হতে আমাকে দান করলেন এবং বললেন, এগুলো রসূলে খোদা (দ.)-এর আমানত। খাজেগানে চিশ্‌ত

হতে আমাকে দেয়া হয়েছিল এবং আমি তোমার কাছে অর্পণ করলাম। এগুলোর হক আমি এবং অন্যান্য খাজেগান যেভাবে আদায় করেছি তুমিও তদ্রুপ করবে, হাশরের দিন যেন আমাদের মাশায়েখগণের সামনে আমাকে লজ্জিত হতে না হয়। আমি তার সমস্ত কথাকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করলাম এবং দু'রাকাত শোকরানার নামায আদায় করলাম। পরে তিনি আমার হাত ধরে স্বীয় মুখ আকাশের দিকে উত্তোলন করে বললেন, 'যাও তোমাকে খোদার হাতে সমর্পণ করলাম এবং তোমাকে তোমার মন্‌জিলে পৌঁছিয়ে দিলাম।'

'ফাওয়ায়েদুস সালেকীন" গ্রন্থে হযরত খাজা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (ক.) উল্লেখ করেছেন যে, হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (ক.)-কে খিলাফত প্রদানকালে হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তী (ক.) বলেছিলেন, "হে কুতুব, তুমি বড় পবিত্র ও সৌভাগ্যবান", অবশ্য এ কথা এ জন্য বলছি যে, আজ ৪০ দিন হতে ক্রমান্বয়ে হযরত রাসূলে করিম (দ.) স্বপ্নে আমাকে ইরশাদ করছেন যে, "কুতুব উদ্দিন আমার ও আল্লাহ্ তা'আলার উভয়েরই বন্ধু, তাকে তোমার খিলাফত দান কর এবং আমার খিরকা যা তোমার কাছে মওজুদ আছে তাকে পরাও।" আজ রাতে আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনিও আমাকে নির্দেশ দিলেন, কুতুব উদ্দিন আমার বন্ধু, যে নিয়ামত তোমার কাছে রয়েছে তাকে তা দান করে তোমার পরবর্তী খলিফা মনোনীত করো।

হযরত খাজা ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকর (ক.)-এর চাদর ও জায়নামায প্রাপ্তি

"রাহাতিল কুলুব" গ্রন্থে হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (ক.) উল্লেখ করেছেন, হযরত খাজা ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকর (ক.) বলেন, বোখারায় শায়খ সায়ফউদ্দিন বাখিরজী (র.) এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর মজলিসে প্রবেশ করে সালাম নিবেদন করলাম। তিনি বসার জন্য নির্দেশ দিলে বসে পড়লাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ ছেলে একদিন সাহেবে খানকাহ্ (দরবেশী মিলনস্থলের অধিশ্বর) হবে। একটু পরে তাঁর পবিত্র কাঁধে রক্ষিত কম্বলটি নামিয়ে আমাকে দান করলেন এবং বললেন, এ গলীম (পশমী কম্বল) গায়ে জড়িয়ে নাও। আমি তাঁর এ নির্দেশকে সৌভাগ্য মনে করে পালন করলাম এবং কিছু দিন তাঁর খেদমতে অতিবাহিত করলাম।

"খায়রুল মাজালিশ" গ্রন্থে হযরত খাজা হামিদ উদ্দিন শায়ের মারূফ কলন্দর (র.) উল্লেখ করেছেন, হযরত খাজা ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকর (ক.) হাসী (একটি এলাকার নাম) হতে তাঁর মুর্শিদ হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (ক.)-এর রওজা মুবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যখন দিল্লী আগমন করলেন তখন দিল্লীর খলিফা মাওলানা বদরুদ্দিন গজনবীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার জন্য গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ওফাতের সময় আমার শায়খ আমার সম্বন্ধে কোন অসিয়ত বা উপদেশ দিয়েছেন কি না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি বলেছেন, "আমার খাস্ মুসল্লা (জায়নামায–যা ত্বরিকতের সিংহাসনের অধিকারীর নিকট গচ্ছিত থাকে) মাওলানা ফরিদুদ্দিন মাস্উদকে (হযরত খাজা ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকর এর প্রকৃত নাম মাস্উদ বিন সোলায়মান) হস্তান্তর করবে। আর দ্বিতীয় অসিয়ত হচ্ছে সে ইচ্ছা করলে আমার বিবিকে নিকাহ্ করতে পারে।" হযরত খাজা ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকর (ক.) বললেন প্রথম অসিয়ত আমি গ্রহণ করলাম কিন্তু দ্বিতীয় অসিয়ত পালন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এরপর মাওলানা বদরুদ্দিন সেই বিশেষ জায়নামাযটি, যা হুজুর আক্রাম (দ.) মিরাজের রাতে আল্লাহ্‌র নিকট হতে মারিফাতের ভাণ্ডারের নিশানা স্বরূপ আনয়ন করেছিলেন এবং দুনিয়া হতে পর্দান্তরিত হওয়ার সময় হযরত মওলা আলী (রা.)-কে দিয়ে গিয়েছিলেন, যা তরিকতের বংশ পরম্পরায় হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (ক.)-এর নিকট পৌঁছেছিল তা হযরত খাজা ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকর (ক.)-এর নিকট হস্তান্তর করলেন।

হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (ক.)-এর খিরকা প্রাপ্তি

"রাহাতিল কুলুব" গ্রন্থে হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (ক.) উল্লেখ করেছেন, ৬৫৫ হিজরীর রজব মাসের ১০ তারিখে বুধবার আমি হযরত সায়্যেদুল আবেদীন সনদুল আরেফীন খাজা শায়খ ফরিদউদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর রহমতুল্লাহি আলাইহির কদমবুসি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। তিনি তাঁর পবিত্র দয়া ও করুণা দ্বারা আমাকে শিষ্যত্বে স্থান দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কুল্লাহ্ চাহার তর্কী (চার টুকরা কাপড়ের তৈরী এক ধরনের টুপী) তাঁর খিরকার (আজানু লম্বা জামা) পকেট হতে বের করে আমাকে পরিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজের পবিত্র খিরকা ও এক জোড়া খড়মও দান করলেন এবং ইরশাদ করলেন, "আমার ইচ্ছা ছিলো হিন্দুস্থানের বেলায়েত অন্যকোন ব্যক্তিকে প্রদান করবো কিন্তু তুমি রাস্তায় ছিলে তাই আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার ইলহাম হলো, "এ নিয়ামত নিজাম উদ্দীনের প্রাপ্য, যখন সে আসবে, তাকে দান করবে।

এ গ্রন্থে আরও বর্ণিত হয়েছে, ২রা রবিউল আউয়াল ৬৫৬ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম হযরত শায়খুল ইসলাম খাজা ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকর্ (ক.) এ অধম নিজামুদ্দিনকে (হযরত খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া-কে) হুজুর তাঁর বিশিষ্ট পোষাক দান করলেন। মজলিসে হুজুরের অনেক বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব ও আহলে সুফ্ফা উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, নিজামুদ্দিনকে হিন্দের বেলায়েত দান করা হয়েছে এবং তাঁকে সাহেবে সাজ্জাদা (ত্বরিকার ক্ষমতাসহ গদীনসীন) করা হয়েছে। যখন আমি এ অভাবনীয় মর্যাদার কথা শ্রবণ করলাম তখন পুনরায় তাঁর কদম মোবারকে সম্মানসূচক সিজদা দিলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, হে জাহাঙ্গীর-এ আলম মাথা তুলো, আমি মাথা তোলার সাথে সাথে তিনি তাঁর পীর ও মুর্শিদের পাগড়ী মোবারক যা তাঁর নিকট আমানত হিসেবে ছিলো তিনি নিজ হাতে সেটা আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন এবং ত্বরিকার আমানত আশা (লাঠি) যা হযরত রাসূলে করিম (দ.) হতে হযরত আলী (রা.)-এর মাধ্যমে হযরত খাজা হাসান বসরী (রা.) হয়ে চিশ্তীয়া ত্বরিকায় প্রবেশ করেছে তা তিনি আমায় দান করলেন এবং ত্বরিকার ও দরবেশী খিরকা যা পূর্বেই দান করেছিলেন। এছাড়া খাজেগানে-চিশ্তী (র.) আজমাইন হতে সিলসিলাহ-ব-সিলসিলাহ (ত্বরিকার বংশ পরম্পরা) যে খিরকা মোবারক তাঁর নিকট আমানত ছিলো তাও তিনি আমাকে পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, দু'রাকাত শুকরানা নামায আদায় কর। যখন আমি নামায পড়ার জন্য

কেবলামুখী হয়েছি তখন তিনি আমাকে আসমানের দিকে মুখ করে বললেন, যাও আমি তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সোপর্দ করলাম। এরপর তিনি বললেন এসব আমি তোমাকে দিচ্ছি এ জন্য যে আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় তুমি যেন অযুধনে না থাক। এরপর সান্তনা দেয়ার জন্য আমাকে বললেন, আমিও আমার মুর্শিদের বেসালের সময় দিল্লীতে ছিলাম না, হাসীতে ছিলাম। এরপর শায়খ বদরুদ্দিন ইসহাককে নির্দেশ দিলেন, খিলাফতনামা লিখে ওকে দিয়ে দাও। তিনি নির্দেশ পাওয়া মাত্র খিলাফাতনামা লিখে হযরত শায়খুল ইসলাম (র.)-এর হাতে দিলেন এবং তিনি তাঁর পবিত্র হস্ত দ্বারা আমাকে দান করলেন। তারপর আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, যাও তোমাকে আল্লাহ্র নিকট সঁপে দিলাম এবং আল্লাহ্র সাক্ষাতকারী করলাম।

হযরত আমির উলা সাঞ্জরী (র.)-এর কুল্লাহ্ চাহার তর্কী (বিশেষ টুপি) প্রাপ্তি

"ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ" গ্রন্থে হযরত আমির উলা সাঞ্জরী (র.) উল্লেখ করেছেন, রবিবার ৩রা শাবান ৭০৭ হিজরী। আমি অধম গোনাহগার খাকসার এ দিন হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র পদপল্লবে আত্মসমর্পণ করে ত্বরিকায়ে চিশ্‌তীয়া গ্রহণ করলাম। হযরত খাজা তার করুণার দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত করে আমায় গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা "কুল্লাহ্ চাহার তর্কী" (চার খন্ডে কাপড়ে তৈরী চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার বিশেষ টুপি) পরিয়ে দিলেন আমার মাথায়। তিনি নির্দেশ দিলেন, প্রতিদিন যথানিয়মে যথাসময়ে ফরজ, সুন্নত ও নফল নামায আদায় করবে। তৎসঙ্গে ইশরাক, চাশ্‌ত ও আওয়াবিনের নামাযও পাঠ করবে। প্রতি চান্দ্রমাসের ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বীজের রোজা রাখবে। তিনি বললেন, মোত্তাকি ও তাইয়েব (তওবাকারী) একই কথা। মোত্তাকি হচ্ছে সে ব্যক্তি যে জীবনে কখনও গোনাহ করেনি। আর তায়েব (তওবাকারী) সে ব্যক্তি যে গোনাহ করেছে কিন্তু তওবা করে পাপমুক্ত হয়েছে। এ উভয়েই পাপমুক্ত বিধায় সমান মর্যাদার অধিকারী।

হযরত খাজা হামিদুদ্দিন সুফি আস্ওয়ালী আন্নাগুরী (র.)-এর খিরকা প্রাপ্তি

হযরত খাজা হামিদুদ্দিন সুফি আস্ওয়ালী আন্নাগুরী (র.) হলেন হযরত খাজা মুঈন উদ্দিন হাসান চিশ্তী সান্জরী (ক.)-এর মুরীদ। তিনি হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (ক.) সহ এক সঙ্গেই হযরত খাজা মুঈন উদ্দিন হাসান চিশ্তী সান্জরী (ক.) হতে খিরকা লাভ করেছিলেন। তিনি মুরীদ হওয়ার পর তাঁর পুরনো বন্ধুরা তাঁকে তাদের সঙ্গদান করতে আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এটা অসম্ভব। তোমরা চলে যাও। তারা বারবার তাঁকে বিরক্ত করতে লাগলো এবং জোর জবরদস্তি করতে লাগলো। শেষে হযরত খাজা হামিদুদ্দিন আন্নাগুরী (র.) তাদের সাহচর্য গ্রহণে অস্বীকার করেন। (ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ)

হযরত ওসমান সিয়াহ (র.)'র খিরকা প্রাপ্তি এবং হযরত আমির খসরু (র.)'র কুল্লাহ্ চাহার তর্কী (বিশেষ টুপি) প্রাপ্তি

"রাহাতুল মুহিব্বীন" গ্রন্থে হযরত খাজা আমির খসরু (ক.) উল্লেখ করেছেন, মজলিশের সমাপ্তকালীন সময়ে হযরত শায়খ ওসমান সিয়াহ্ (র.) কড়জোরে আরজ করলেন যে কাউয়াল উপস্থিত আছে, যদি আপনি অনুমতি দেন তবে সে 'সামা' পরিবেশন করতে পারে। হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (ক.) অনুমতি দিলেন। কাউয়াল (গায়ক) রাগ পরিবেশন করতে আরম্ভ করলো। প্রথম স্তবক শোনার পরই হযরত খাজা এক অদ্ভুত ও আশ্চর্য অবস্থার মধ্যে অবগাহন করলেন। অবশ্য এ হাল বা অবস্থা তার জন্য সাধারণই ছিলো। কিন্তু তাঁর এ হাল হযরত ওসমান সিয়াহ ও উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপর এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করলো। সকলেই ঐশী-অচৈতন্যলাকে অবস্থান করে অজ্‌দ করতে করতে হযরত খাজার কদম মোবারকে পতিত হয়ে আবার উঠে যাচ্ছিলেন এবং অজ্‌দ করছিলেন। পুনরায় তাঁর পদপল্লব হতে ঐশী আকর্ষণ গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমে আকর্ষিত হয়ে অজ্‌দ করছিলেন। তাঁদের হাল যে কি প্রকার হয়েছিলো এবং অজ্‌দ-এর কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন তা এ লেখনীর মাধ্যমে বুঝানো সম্ভব নয়। তাদের এ হাল চাশ্‌ত-এর (সূর্যোদয়ের পর) সময় হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। এরপর হযরত খাজা আস্তে করে বসে পড়লেন এবং অন্যান্যরাও তাকে অনুসরণ করে বসে পড়লেন। অতঃপর হযরত খাজা তার নিজের পরিধেয় খিরকাটি (আজানুলম্বিত জামা) হযরত ওসমান সিয়াহ (র.)-কে দান করলেন এবং আমি অধমকে [হযরত আমির খসরু (র.)] দান করলেন তাঁর বিশিষ্ট কল্লাহ্ (টুপী)।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)’র স্বপ্নে নবী করিম (দ.) এর চাদর প্রাপ্তি

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) তাঁর ‘আদ্ দুররুস সামীন ফি মুবাশ্শারাতীন নাবীইয়্যিল আমিন’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

(১) গুজরাটের একটি মসজিদে আসরের নামাযের পর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম হযরত রাসূলে করিম (দ.) তশরীফ এনেছেন এবং আমাকে একটি চাদর পরিয়ে দিলেন। এতে ইলমে শরীয়তের কতিপয় কঠিন বিষয় আমার কাছে প্রকাশিত হল, সময়ে সময়ে তা আমার নিকট আরও বৃদ্ধি পেতে থাকল।

(২) একদিন আমি স্বপ্ন দেখলাম, হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হোসাইন (রা.) আমার ঘরে শুভাগমন করেছেন। হযরত হাসান (রা.) নিব ভাঙ্গা একটি কলম আমাকে দান করার জন্য হাত বাড়ালেন এবং বললেন, এটি আমার নানার কলম মুবারক। অতঃপর তিনি থেমে গেলেন এবং হযরত হোসাইন (রা.)-কে কলমটি মেরামত করে দিতে বলেন। হযরত হোসাইন (রা.) তা মেরামত করে দিলে তিনি আমাকে উপহার দেন। এরপর একটি চাদর নিয়ে আসা হল এবং হযরত হোসাইন (রা.) তা হাতে নিয়ে বললেন, এটি আমার নানার চাদর মুবারক। তিনি চাদর মুবারক আমাকে পরিয়ে দিলেন। সেদিন থেকেই ইলমে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখিতে আমার অন্তর প্রসারিত হয়ে যায়।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী [ক.]'র খিরকা সম্পর্কিত বর্ণনা

আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার 'চাদর'-এর প্রতিনিধি গাউসুল আযম শাইখ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) – ৬৫

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র বেলায়তী খিরকা, চাদর ও পাগড়ি মোবারক – ৬৭

বেলায়তে মা'আব হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর খিরকা প্রাপ্তি – ৬৮

গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর খিরকা প্রাপ্তি – ৬৯

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর খিরকা ও চাদর প্রাপ্তি – ৭০

আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার 'চাদর'-এর প্রতিনিধি গাউসুল আযম শাইখ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)

> "তুমি একবার আমার চাদরের নিচে এসে দেখ। আসমান, জমিন, আর্‌শ, কুর্‌সি, লৌহ, কলম, বেহেশ্‌ত, দোযখ তোমাকে এক পলকে দেখিয়ে আনি।"

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) তাঁর মেজ ভাই হযরত সৈয়দ আবদুল হামিদ মাইজভাণ্ডারী (র.)-এর এক প্রশ্নের জবাবে এই কালামটি করেছিলেন। এই চাদর মূলত কোন বস্তুগত চাদর নয়। তিনি আল্লাহ্‌র মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বে ফানাফিল্লাহ্ হয়ে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদানে দায়িত্ব প্রাপ্ত সত্তা হিসেবে "আমার চাদর' উল্লেখ করেছিলেন। এই চাদর মূলত আল্লাহ্‌র অহংকারের চাদর, শ্রেষ্ঠত্বের পোষাক। এই অদৃশ্যমান চাদরের অধিকারী অলিউল্লাহ্‌গণের পরিচিতি হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা হাদিসে কুদ্‌সিতে ঘোষণা করেছেন "নিশ্চয় অলিউল্লাহ্‌গণ আমার আজমতের জুব্বা বা চাদরের নিচে অবস্থান করেন।" আল্লাহ্‌র এই প্রিয় বান্দাগণ অনেক সময় নিজেদেরকে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপনে আল্লাহ্‌র কথাসমূহ নিজ জবানে প্রকাশ করেন। তখন তাদের কথা মূলত আল্লাহ্‌রই কথা হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র অহংকার 'চাদর'-এর নিচে অবস্থানকারীর মর্যাদাপ্রাপ্ত এবং আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদানের এই দায়িত্ব হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীকে প্রদান করা হয়েছে হযরত রাসূলে করিম (দ.)-এর মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্‌র (দ.) দুইটি টুপির (তাজ) মধ্যে একটি টুপি আমার মাথায়, অপরটি আমার ভাই বড় পীর সাহেবের মাথায় দিয়েছেন।" উল্লেখ্য, নবুয়ত পরবর্তী বেলায়তের যুগ দুইভাগে বিভক্ত। এক, বেলায়তে মোকাইয়াদা যুগ, দুই, বেলায়তে মোত্‌লাকা যুগ। বেলায়তে মোকাইয়াদা যুগে আল্লাহ্‌র অহংকার 'চাদর'-এর নিচে অবস্থানকারীর মধ্যে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত এবং আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদানের 'প্রধান'

হিসেবে ছিলেন গাউসুল আযম শাইখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এবং বেলায়তে মোত্লাকা যুগের আছেন গাউসুল আযম শাইখ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)। হযরত রাসূলে করিম (দ.) তাঁর স্থায়ী আহমদী বেলায়ত পদ্ধতির মূল প্রতিনিধির দায়িত্ব হযরত আলী (রা.)-কে প্রদানের মাধ্যমে ত্বরিকতের সকল সিলসিলার বা ত্বরিকার উৎসমূলে হযরত আলী (রা.)'র অবস্থান নিশ্চিত করে রাসূলে করিম (দ.) বলেছেন "আমার পর আলীই তোমাদের অভিভাবক"। অর্থাৎ হযরত রাসূলে করিম (দ.) যে সকল ধারা বা সিলসিলার মাধ্যমে বেলায়তকে বিকশিত করেন, সে সকল ধারা বা সিলসিলা হযরত আলী (রা.) এর ব্যক্তিত্বে কেন্দ্রীভূত হয়। হযরত রাসূলে করিম (দ.) এর সাহচর্য্য ও সোহবত হতে উম্মতদের ৩ প্রকারের ফয়েজ বরকত হাসেল করার ধারা বা সিলসিলার রেওয়াজ ছিল। যথাঃ ত্বরিকায়ে আবরারে মোজাহিদীন, ত্বরিকায়ে আখিয়্যারে সালিহীন এবং ত্বরিকায়ে শোহাদায়ে আশিকিন। এই সিলসিলা তিনটি হযরত রাসূলে করিম (দ.) এর জমানায়, পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামের জমানাতেও বিরাজমান থাকার প্রমাণ বহন করে। পরবর্তীতে এই ধারাসমূহ হযরত আলী (রা.) এর মাধ্যমে সুবিন্যস্তভাবে সজ্জিত ও বিকশিত হয়। হযরত রাসূলে করিম (দ.) হতে ফয়েজ অর্জনের তিনটি বেলায়তী ধারা হযরত আলী (রা.) এর মাধ্যমে যথাক্রমে হযরত ইমাম হাসান (রা.), হযরত হাসান বসরী (রা.) এবং হযরত উয়ায়েস আল্-কারনী (রা.)-কে অর্পণ করেন। "এই তিনটি বেলায়তী ধারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গতিপথে স্থান কাল পাত্রভেদে বহুরূপে ছোট, বড়, মাঝারী ধারা-উপধারার জন্ম দেয়। এই তিনটি ধারার বিষয়বস্তুও এক স্রষ্টা অনুরাগ (বেলায়তে মোত্লাকা)"। বস্তুত এই ত্রিবিধ বেলায়তী ধারাই ধর্মীয় জগতে ত্বরিকতপন্থার জন্ম দেয় এবং যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ত্বরিকা ও শাখা ত্বরিকার সৃষ্টি হয়। এই তিনটি বেলায়তি ধারা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর ব্যক্তিত্বে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে তিনি বেলায়তে মুহিত বা সর্ববেষ্টনকারী বেলায়তের ধারক ও বাহক এবং বেলায়তে মোত্লাকা যুগের প্রধান প্রতিনিধি হয়েছেন, যা মূলত হযরত আলী (রা.) এর বেলায়তের মূল প্রতিনিধির পরিচায়ক। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত গাউসুল আযম জিলানী (ক.) এবং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) উভয়কে বিশেষ জ্ঞান দান করে প্রেরণ করেছেন। এই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারীগণই যে আল্লাহ্র অহংকার 'চাদর' এর প্রতিনিধি হন, সেটি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী পবিত্র বাণীর প্রকৃত ঘটনা উপস্থাপনে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হিসেবে জানা যাবে। ঘটনাটি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী শরিফের অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদে 'হযরতের হাকিকত রহস্যময় জজ্বাতি কালামে স্বমর্যাদা নির্দেশ ও উপদেশাবলী' শিরোনামে উল্লেখিত আছে :-

একদা তাহার মধ্যম ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল হামিদ সাহেব তাহার খেদমতে আরজ করিয়া বলিয়াছিলেন, “দাদা আপনি এতবড় আলেম হইয়া জজ্‌বার হালতে এইরূপ গালিগালাজ ও বকাবকী করেন কেন?”। তখন হযরত তাহাকে বলিয়াছিলেন, “ভাই আবদুল হামিদ, তোমার স্ত্রী যখন ভাত পাক করে, তুমি কি তাহা দেখিয়াছ? পাতিলের মুখে ঢাকনি থাকে কিনা। যদি ঠিক না থাকে তবে তোমার চিন্তা করা উচিত। সামান্য অগ্নিতাপে পাতিলের ঢাকনী উত্তপ্ত হইয়া অসহ্যে উছলিয়া পড়ে। অথচ খোদার অফুরন্ত অবর্ণনীয় দাউ দাউ আকারে প্রজ্জলিত প্রেমাগ্নি মানবদেহে যখন উত্তাপ বিস্তার করে, এলেমের ঢাকনী তখন কি করিতে পারে? আহমদ উল্লাহ্‌র কাছে খোদা প্রদত্ত এলেম আছে বলিয়াই তো এতদূর বরদাস্ত করিয়া আসিতেছে। তুমি একবার আমার চাদরের নীচে আসিয়া দেখ। আসমান, জমিন, আরশ, কুরসি, লৌহ, কলম, বেহেশ্‌ত দোযখ তোমাকে এক পলকে দেখাইয়া আনি। তবে তুমি বুঝিতে পারিবে। আমি কেন এইরূপ করি!”

‘হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র বেলায়তী খিরকা, চাদর ও পাগড়ি মোবারক

আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার ‘চাদর’-এর নিচে প্রতিনিধিত্বের বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত ও প্রধান আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদানকারী হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী উক্ত চাদরের নিচে বিশেষ মর্যাদায় মর্যাদাপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিক নেতৃত্বপ্রদানকারী খোলাফায়ে কেরামকে দৃশ্যমান চাদর, খিরকা ও পাগড়ি প্রদানের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়ার ঘটনা মাইজভাণ্ডারী সিলসিলাতে বিদ্যমান। এটি ছিল মূলত নবী রাসূল ও অলিউল্লাহ্‌গণের সুন্নত, পীর-মুর্শিদের বিশেষ বন্ধনের প্রতীক। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র জীবদ্দশায় ও তাঁর ওফাতের পর কাউকে শুধুমাত্র খিরকা প্রদানের মাধ্যমে, আবার কাউকে খিরকা ও চাদর উভয়ই প্রদানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদানের স্বীকৃতি স্মারক প্রদান করেছেন। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার ইতিহাসে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হতে তিনজন সুফি আনুষ্ঠানিকভাবে খিরকা গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে কেউবা একবার আবার কেউবা একাধিকবার।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হতে ১ (এক) বার খিরকা প্রাপ্ত হয়েছেন ২ জন, তাঁরা হলেন:

১. বেলায়তে মা’আব হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)

২. গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) [প্রকাশ: বাবাজান কেবলা]

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হতে ২ (দুই) বার খিরকা ও চাদর প্রাপ্ত হয়েছেন ১ জন, তিনি হলেনঃ

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) [প্রকাশঃ শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী]

বেলায়তে মা'আব হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর খিরকা প্রাপ্তি

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক ও পূর্ণতাদানকারী গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র একমাত্র পুত্রসন্তান তিনি। তাঁর জন্ম ১২৮২ হিজরী ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক বাংলা ১৩ চৈত্র। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর স্বনামধন্য খলিফা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (ক.) তাঁর 'আয়নায়ে বারী' গ্রন্থে হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) আধ্যাত্মিক মহিমা বর্ণনায় "বেলায়তে মা'আব" লকবটি উল্লেখ করেছেন। যার অর্থ তিনি (সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী) হলেন স্বয়ং হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বেলায়তি ক্ষমতার ধারক। খোদা তা'আলার ইচ্ছায় স্বীয় পিতা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) দুনিয়াবী হায়াতে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ১৯০২ সালে ৩৭ বৎসর বয়সে ওফাতপ্রাপ্ত হন। হযরত সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র বেলায়তি চাদর ও পাগড়ি মোবারক প্রাপ্তির ঘটনা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী শরিফে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে :-

আমার (হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী) পিতা হযরতের একমাত্র পুত্র শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেবের ওফাত হওয়ার কয়েকদিন পর একদা (হযরত কেবলা) একখানা শাল কাপড় (চাদর) ও নিজের পাগড়ি মোবারক দিয়া বলিলেন, "এই শাল কাপড়খানা আমার ফয়জুল হক মিয়ার কবরের উপর পড়াইয়া দাও এবং এই পাগড়িটি তার ছিরানে রাখিয়া দাও। দস্তার বাঁধিবার জন্য তার আরজু ছিল। আমি তাহাকে জনাব মৌলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (র.)-এর চেহারার উপর রাখিয়াছি।"

গাউসুল আযম বিল বিরাসত
হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান
মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর খিরকা প্রাপ্তি

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক ও পূর্ণতাদানকারী গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ৩য় ভ্রাতার ২য় পুত্র গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) (১৮৬৫-১৯৩৭)। তিনি কুত্বিয়ত ধারা মতে ফয়েজ প্রাপ্ত মগলুবুল হাল মাদার মশরব কুত্বুল আকতাব লকবে কামালিয়তের উচ্চাসন লাভ করেছিলেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী শরিফে খলিফাগণের তালিকায় তাঁকে 'খলিফা-এ-আযম' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হতে তাঁর খিরকা প্রাপ্তির ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ :-

হযরত বাবাজান কেবলা (ক.) ২৫ বৎসর বয়সে জমায়াতে উলার ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্বাচিত হলেন। নিজ পীর হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও পিতা-মাতার দোয়ার জন্য বাড়ী আসলেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সামনে দোয়া প্রার্থী হয়ে হাজির হন কিন্তু অনুমতি প্রার্থনা না করে বারবার ফিরে আসেন। একদিন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী নিজ বাড়ীর দক্ষিণদিকস্থ কাটাখালী নামক খালের কূলবর্তী সরিষা ক্ষেতের ধারে আশেকভক্তদের সাথে বসে কথা বলছিলেন। এমন সময় হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর একমাত্র পুত্র ও হযরত বাবাজান কেবলার ভাইসহ হযরত বাবাজান কেবলা তথায় উপস্থিত হন। হযরত বাবাজান কেবলা অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হঠাৎ জজ্বা হালে অনেক কিছু বললেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী স্বীয় পুত্র হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারীকে তাঁর দোয়ার মেহরাব নামীয় হুজরা শরিফের তাক হতে হরিরী খিরকা (জুব্বা) নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। খিরকাটি তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করা হলে প্রথমে তিনি নিজে সেটি পরিধান করেন এবং এরপর খিরকাটি হযরত বাবাজান কেবলাকে পরিয়ে দেন।

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর খিরকা ও চাদর প্রাপ্তি

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক ও পূর্ণতাদানকারী গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র প্র-পৌত্র এবং মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে তিনি "শাহানশাহ্" লকবে সর্বাধিক পরিচিত। এছাড়া হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী পৌত্র অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর ১ম পুত্র হিসেবেও পারিবারিক জীবনে বড় ভাইয়ের আসনে তাঁর মর্যাদা সম্মানিত।

মুর্শিদ হতে মুরিদের প্রতি আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদানে দায়িত্ব প্রাপ্তির স্বীকৃতি সিলসিলাগত রেওয়াজ অনুসারে প্রদান করা হয়ে আসছে। আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার 'চাদর'-এর নিচে প্রতিনিধিত্বের বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত ও প্রধান আধ্যাত্মিক নেতৃত্বপ্রদানকারী হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হতে আধ্যাত্মিক শৃংখলা অনুসারে দুইবার যথাক্রমে খিরকা ও চাদর গ্রহণ সুফি জগতে হযরত শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর বিশেষ মর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর খিরকা প্রাপ্তি

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রথমবার খিরকা প্রদানের পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন "জিয়াউল হক আমিই"। এ যেন মাদারজাত অলি হিসেবে পূর্ব হতেই শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বে বিলীন হয়ে যাওয়ার পরিচায়ক। কারণ খিরকা প্রাপ্তির পূর্ব হতেই শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী জীবনাচরণে অলিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর খিরকা প্রাপ্তির ঘটনা তাঁর জীবনী শরিফের 'কঠোর রিয়াজত সাধনা অধ্যায়'-এ নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছেঃ

"অত্যধিক প্রেরণার দরুন ক্রমশঃ তিনি (শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী) আহার-নিদ্রা একেবারেই ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি সর্বভোলা হয়ে গেলেন। মাথায় অনেক পানি ঢালার পরও শান্ত অবস্থা ফিরে আসে না। বড় ছেলের এহেন অবস্থায় পিতা (অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী) বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এক রাত্রে তিনি চিন্তাযুক্ত হয়ে বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন হযরত সাহেব

কেবলা (হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী) পার্শ্বে এসে বলছেন, 'আপনি এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? আমার হরিণ রঙয়ের ক'বা (খিরকা) অর্থাৎ জুব্বাটা তাঁর গায়ে পরিয়ে দেন।' তাড়াতাড়ি রওজা শরীফ সংলগ্ন স্মৃতি-ঘর হতে জুব্বাটা খুঁজে এনে ছেলের গায়ের উপর চড়িয়ে দিয়ে তিনি আপন হুজরায় প্রবেশ করেন। একটু তন্দ্রা আসলে অনুভব করেন, কে যেন হুজরার দরোজা খুলতে চেষ্টা করছে। উঠে দেখেন ছেলে। কক্ষে ঢুকে তাঁর পাশে শুয়ে পড়েন। রাত গিয়ে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু ঘুম আর ঘুম; জেগে উঠলে তাঁর অবস্থা প্রায় শান্ত। স্নান ও আহার করিয়ে পুনঃ বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হলো। এবারও সারারাত এবং পরদিন সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘুমালেন। তারপর সম্পূর্ণ শান্ত ও সুস্থ। কিছুদিন পর তিনি পুনঃ ভাববিভোর হয়ে যান।"

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর চাদর প্রাপ্তি

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) দ্বিতীয়বার চাদর প্রদানের পূর্বে ঘোষণা করেছেন "জিয়াউল হক মিয়ার আমানত তাকে অর্পণ করুন।" আমানত ঘোষণার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদানের এই দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক পূর্ব হতেই নির্ধারিত হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়াও আমানত অর্পণের ঘোষণার মাধ্যমে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার 'চাদর'-এর নিচে বিশেষ মর্যাদার অবস্থানে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হিসেবে মাইজভাণ্ডারী সিলসিলা তথা আওলিয়ায়েকেরামের মধ্যে অন্যতম অগ্রজ হিসেবে তাঁর পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। হযরত শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর খিরকা প্রাপ্তির ঘটনা তাঁর জীবনী শরিফের 'মহান তিনে মহাশক্তি অধ্যায়'-এ নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে :-

মাঘ মাসের দুই তারিখ, ষোল জানুয়ারি ১৯৬৬ সাল। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত সাহেব কেবলার স্বপ্নে তাঁর (শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর) পিতাকে (অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে) নির্দেশ দেন, "জিয়াউল হক মিঞার আমানত তাকে অর্পণ করুন।"

৯ মাঘ, তেরশ তিয়াত্তর বঙ্গাব্দ। উরস শরিফ উপলক্ষে দেশ-বিদেশ দূর-দূরান্ত হতে বহু লোক এসেছে এবং আরো আসছে। পরদিন দশ মাঘ উরস শরিফের প্রধান অনুষ্ঠান। সকাল এগারটায় রওজা পাক গোসল দেওয়া হয়। হযরত সাহেব কেবলার অছি-স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব স্বপ্নের নির্দেশ পালনে রওজা শরিফ স্মৃতিকক্ষ হতে হলুদ ও খয়েরি রংয়ের দু'খানা চাদর খাদেম মালেকের দ্বারা আনয়ন করেন। অতঃপর

হযরতের পবিত্র গদি শরিফে দু'পা ঝুলিয়ে রওজামুখী হয়ে বসেন। পুত্রকে আনার জন্য দরবারের প্রধান কর্মকর্তা মাওলানা সৈয়দ মাহফুজুল করিম সাহেবকে পাঠান। তিনদিন হতে যে ঘরের দরজা বন্ধ মাওলানা সাহেব দরজায় পৌঁছামাত্র খোলেন। হযরতের আমানত গ্রহণের জন্য তাঁকে নিতে পাঠিয়েছেন বলে জানালে খুবই শান্তভাবে বলেন, 'আচ্ছাজী, আমি জানি। একটু অজু করে আসি।' হুজরায় গিয়ে পিতাকে যথাবিহিত সম্মান জানিয়ে একটু দূরে নতজানু হয়ে পিতার মুখোমুখি এমনভাবে বসেন যেন হযরত সাহেব কেবলা ও হযরত বাবা ভাণ্ডারীর রওজা শরীফ পিছনে না পড়ে। হলুদ রংয়ের চাদরটা নিজ গায়ে জড়িয়ে পিতা গুরুগম্ভীর স্বরে বলেন, "হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) যে পবিত্র মহান আমানত আমার হেফাজতে ছিলো তা আজ আপনাকে অর্পণ করছি; হেফাজত করবেন।" একথা বলে খয়েরি রংয়ের চাদরখানা নিজ হাতে ছেলের গায়ে পরিয়ে দেন। ছেলের কণ্ঠে ধ্বণিত হয়, 'আলহামদুলিল্লাহ্'। এ সময়ে হুজরার বারান্দা ও মাঠে উপস্থিত ছিলেন হযরত সাহেব কেবলার খলিফা মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদীর (র.) পুত্র আলহাজ মাওলানা সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম, বাঁশখালীর প্রসিদ্ধ জমিদার হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ফটিকছড়ি থানার আজিমপুর গ্রামের এডভোকেট আফসার উদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ান বাজারের জনাব আরহাম আলী চৌধুরী, বোয়ালখালী থানার সারোয়াতলীর ডাঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী এবং আরো অনেকে। চাদর পরিয়ে দিলে তাঁর মস্তক ও শরীর হতে বিন্দু বিন্দু ঘাম বের হতে থাকে। হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী এভাবেই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রতিনিধিত্ব লাভ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে স্পষ্ট করে বলা যায় যে, সুফি খিরকা প্রধানত ঐশী জলসার আচ্ছাদন হিসেবে তাসাওউফ জগতে প্রবর্তিত হয়েছে। সুফি খিরকার পরশে তাসাওউফ সাধকের সাধনাক্ষেত্র স্বীয় মুর্শিদের তত্ত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণে থাকে। সাধন, ভজন, রিয়াজতকালে সুফি খিরকা সাধককে যে কোন প্রতিকূল পরিবেশ উত্তরণে সহায়তা দিয়ে থাকে। তাজকেরাতুল আওলিয়া গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায় অনেক সাধক পাহাড়, পর্বত, বন-জঙ্গলে একাকী এককত্বের সাধনায় আত্মনিমগ্ন থাকাকালে খিরকার খুশবোর কারণে হিংস্র বন্য জন্তুরা আক্রমনের পরিবর্তে তাদেরকে যথার্থ নিরাপত্তা দিয়েছে। খিরকা ঐশী প্রতাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত নিশান হওয়ায় সাধকের অবস্থা, পদমর্যাদা ভেদে এর মর্তবাও ভিন্ন ভিন্ন। হযরত আবুল হাসান খেরকানী (র.) এবং হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের (র.)-এর মধ্যে পরীক্ষামুলকভাবে পারস্পরিক খিরকা বদলের ঘটনাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হযরত আবুল হাসান খেরকানী (র.) ছিলেন আত্মনিমগ্ন শান্ত স্বভাবের অতি উচ্চ মর্যাদার সাধক। অন্যদিকে হযরত আবু

সাঈদ আবুল খায়ের (র.) ছিলেন প্রেম তাড়নায় আবেগ উচ্ছ্বাস প্রেরণাদীপ্ত সাধক। একজন ছিলেন ধ্যান নিমগ্নতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অন্যজন ছিলেন কাউয়ালীর সুরে সুরে মাতোয়ারা। একরাতে উভয়ের পারস্পরিক সম্মতি সাপেক্ষে নিজেদের খিরকা বদলা-বদলি করলে দেখা যায় আত্মনিমগ্ন শান্ত স্বভাবের সাধক হযরত আবুল হাসান খেরকানী (র.) প্রেম-প্রেরণাধিক্যের জোয়ারে সারা রাত আর্ত-চিৎকার করে কাটান। অন্যদিকে হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের সারা রাত আত্ম নিমগ্নতায় অত্যন্ত শান্ত স্বভাবে সারা রাত অতিবাহিত করেন। খিরকার প্রভাবে সাধকের আত্মা থাকে একাগ্র। খিরকার কারণে সুফি সাধকরা পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় অথবা কোন প্রকার প্রশাসনিক চাপে ও নিজস্ব এখতিয়ারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। হযরত হোসাইন মনসুর হাল্লাজ (র.) এর মৃত্যুদন্ড বিষয়ে বার বার সরকারী তাগাদা সত্ত্বেও সুফি সম্রাট হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) সুফি খিরকা খুলে জাহেরী আলেমের পোশাক পরিধান করে স্বীয় খানকাহ্ থেকে বের হয়ে মাদ্‌রাসায় প্রবেশ করে মৃত্যুদন্ডের পক্ষে সূক্ষ্ম বর্ণনা সাপেক্ষে স্বাক্ষর দিতে হয়েছিল। ভারত বর্ষে হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (র.) তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত আলাউদ্দিন আলাউল হক (র.)-এর নিকট থেকে খিরকা প্রাপ্ত হয়ে পীরের নির্দেশে জৌনপুরে গমন করেন। তখন সেখানে হযরত শেখ হাজী চেরাগে হিন্দ (র.) এর ব্যাপক প্রভাব প্রতিপত্তি চলছে। শংকা ও ভয়ভীতি নিয়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হলে বিভিন্ন মোনাজেরার সম্মুখীন হন। সেখানে তাঁর কোন পরিচিত বা ভক্ত অনুরাগী ছিল না। বলত গেলে সকলেই তাঁর প্রতিপক্ষ। এ ধরনের বিরূপ পরিস্থিতিতে সুফি খিরকার অনন্ত মহিমায় মোনাজেরার প্রধান আয়োজন নবী করিম (দ.) এর স্বপ্নাদেশে হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর (র.) পক্ষালম্বন করলে প্রতিপক্ষ সংযত হয়ে যায় এবং বিতর্কে তিনি বিজয়ী হন। অতঃপর সেখানে তিনি স্থায়ী খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ভারতের আযমগড়ে অবস্থিত। এ ধরনের অসংখ্য বর্ণনা সুফি খিরকার গুরুত্ব অনুধাবনের স্বপক্ষে প্রদান করা যায়।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন, আমিন।

তথ্যসূত্র

১. আল কুরআনুল কারীম
২. হাদিস শরিফ
৩. আসল কাসাসুল আম্বিয়া : সংকলনে মাওলানা আবু নায়ীম
৪. গওসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী : মাওলানা নুরুর রহমান
৫. হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবনী ও কারামাত (১ম সংস্করণ) : মাওলানা মোঃ ফয়েজ উল্লাহ ভুইয়া
৬. বেলায়তে মোতলাকা (২য় প্রকাশ) : হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)
৭. আনিসুল আরওয়াহ : হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.)
৮. দলিলুল আরেফিন : হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.)
৯. ফাওয়ায়েদুস সালেকীন : হযরত খাজা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (র.)
১০. রাহাতুল কুলুব : হযরত খাজা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (র.)
১১. ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ : হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)
১২. রাহাতুল মুহিব্বীন : হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)
১৩. খায়রুল মাজালিশ : হযরত খাজা নাসির উদ্দিন মাহমুদ চিরাগে দেহলী (র.)
১৪. রুহে তাসাউওফ : সৈয়দ মুহাম্মদ গেছু দারাজ বান্দা নওয়াজ (র.)
১৫. কোরআন হাদিসের আলোকে সূফীতত্ত্ব ও সূফীবাদ : সৈয়দ ইউসুফ হাশেম আর-রেফায়ী
১৬. গদীরে খুম-এর ঘোষণা : ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
১৭. **The Sufi Robe (Khirqa) As A Vehicle Of Spiritual Authority : Jamal J. Elias**

macademy2002@gmail.com
/alokdharabooks

ISBN 978-984-8083-22-2